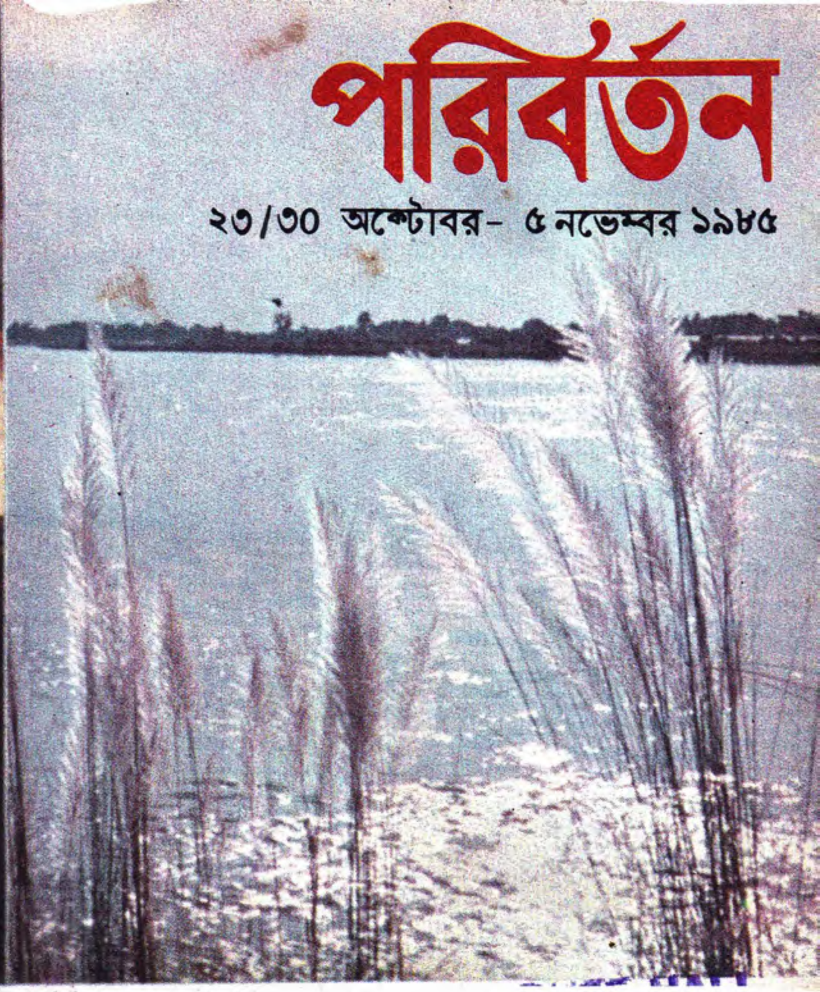
পরিবর্তন

২৩/৩০ অক্টোবর- ৫ নভেম্বর ১৯৮৫





হাত দেখে মানুষ চিনুন

গেলার রহস্য ও অন্যান্য বিচিত্র রচনা





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


হীরামনের হাহাকার
কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস
১২৯
শহরে কিছু কাজ আছে। আপনার গাড়িটার--
পিঠে চাপবেন তো স্বচ্ছন্দে। ফিরবেন কিন্তু হেঁটে---
গাড়িতেই ফিরবে। গুলমহম্মদ গাড়ি চালাতে জানে, বিকেলে বাজারে পাঠাব। ফেরার সময়ে······
গুলমহম্মদ। বিকেলে শহরে যাবে। আসবার সময়ে এঁকে নিয়ে আসবে।
অলরাইট, স্যার।
বিকানির হোটেলের সামনে থাকব। কখন আসবে
পাঁচ বাজে। ইউ লেট, নো মিটিং।
মানিব্যাগটা পকেটে নিয়ে বসবার ঘরে ফিরল অখণ্ডনারায়ণ
তোমার বাবা ফোন করলে আমি বলে দেব, নেকলেস পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিতে বলেছ তুমি
নিশ্চয় বলবেন আপনার কথায় বিশ্বাস না হলে সন্ধ্যের দিকে ফোন করতে বলবেন।
শনিবারে কখনও বাড়ি ফেরেন না বাবা--ফোনও আসবে না।

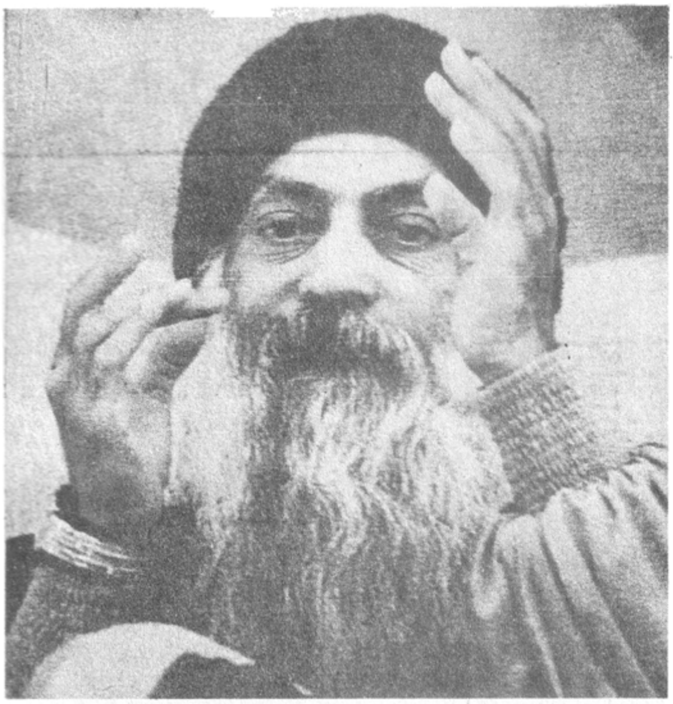

আহা চুলের কি বন্যা, যেন প্রকৃতির কন্যা
চিকন-চিকন মনোহরা
প্রকৃতির তাজা গুণে ভরা
টিয়ারা হার্বাল
কণ্ডিশনিং
শ্যাম্পু
TIARA BALSAM
HERBAL SHAMPOO PLUS CONDITIONER
For Normal Hair
TIARA HENNA
HERBAL SHAMPOO PLUS CONDITIONER
For Oily Hair

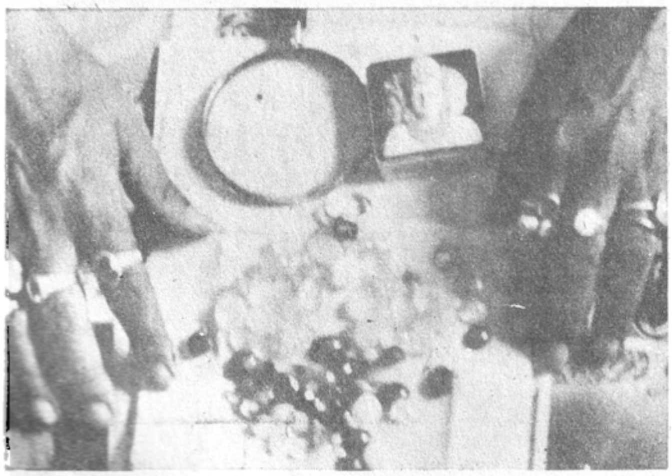


উজ্জ্বলতার মেজাজ
এনটাইস®
বস্ত্র
MCA/NTC/ 109 BEN
সুরুচিরপূর্ণ। সহজ সাধ্য দামে।
ন্যাশন্যাল টেকসটাইল কর্পোরেশন
(তামিলনাড়ু ও পন্ডিচেরী) লিমিটেড
ভারত সরকারের একটি সংস্থা
১০/৬৪, সোমসুন্দরম্ মিল রোড,

পরিবর্তন

২৩ / ৩০ অক্টোবর—৫ নভেম্বর ১৯৮৫, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১৭-১৮
প্রতি সংখ্যা ৩ টাকা
বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা


'ভগবান' রজনীশ


হাত দেখে মানুষ চিনুন


আমেরিকায় নব-তাজমহল

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদের রঙিন ফটো—
শরতের আকাশ : প্রদীপ ঘোষ
আমেরিকায় ইসকনের মন্দির :
মানিক সরকারের সৌজন্যে

প্রধান উপদেষ্টা : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর ও রেজিঃ অফিস : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট), কলকাতা ৭০০ ০৭২

চিফ এগজিকিউটিভ, বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ : সি এইচ বসু, কলকাতা
দিল্লি অফিস : জোনাল ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন : ওয়াই এ শেঠি। জনসংযোগ : শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নিউ দিল্লি ১১০ ০০১
ফোন : ৩৩১-৭০২৪
দিল্লি সংবাদদাতা : সুজিত রায়
বোম্বাই প্রতিনিধি : ভি সত্যমূর্তি : ফ্ল্যাট নং ১, বিল্ডিং নং ৪, টুইনকল স্টার কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, ঘাটলা, চেমবুর, বোম্বে ৪০০ ০৭১, ফোন : ৫৫১-৬২৬২, ৫৫১-০৫৯২

নিবেদনমিদং

২৩ ও ৩০ অক্টোবর আমাদের যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হল। প্রতি বছরই পুজোর কদিন আমাদের ছুটি থাকে। সেজন্য একটি সংখ্যা বন্ধ রাখতে হয়। তাই দুটি সংখ্যাকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ৬ নভেম্বর।

পরিবর্তন পুজো সংখ্যার আশাতীত সাফল্যে আমরা ভীষণভাবে উৎসাহিত। পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই বহু স্টলে পুজো সংখ্যা পরিবর্তন-এর সব কপি বিক্রি হয়ে গেছে। পরিবর্তন-এর সাফল্য, একটি এক্সপেরিমেন্টের সাফল্য। এতে প্রমাণ হল লিখিয়েদের কোন জাত নেই। পুজো সংখ্যা মানেই যে পরিবর্তন—এ অহঙ্কার আমাদের নেই। তবে পরিবর্তন পুজো সংখ্যা আলাদা ধরনের পুজো সংখ্যা। ইংরেজিতে যাকে বলে 'উইথ এ ডিফারেন্স'। পুজো সংখ্যা শব্দশৃঙ্খলও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। আমরা ঠিক করেছি পুজো সংখ্যার শব্দশৃঙ্খলের বিজেতাদের আমরা যে পুরস্কার দেব, দেব এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে পরিবর্তন-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান। বসবে পাঠক-পাঠিকাদের মৈত্রী মিলন মেলা। উপন্যাস প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রাপককে দেওয়া হবে পুরস্কার। ১৯৮৪ সালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে যিনি পাঠকদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁকেও আমরা অনুরোধ জানাব এই উৎসবে সংবর্ধনা নিতে। উৎসবের নির্দিষ্ট তারিখ আমরা শিগগিরি ঘোষণা করছি। যাঁরা এই উৎসবে যোগ দিতে চান ১৮ নভেম্বরের মধ্যে সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখলে তাঁদের আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

পুজো সংখ্যা পরিবর্তন কেমন লাগল এ সম্পর্কে আপনাদের চিঠিপত্র আমরা আগেই আহ্বান করেছি। পুরনো বছর প্রায় শেষ হতে চলল। আগামী বছরের পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা এখন থেকেই চিন্তা ভাবনা শুরু করেছি। আপনাদের যদি কোন সুপারিশ থাকে তাহলে অবিলম্বে আমাদের কাছে পাঠান। ১৯৮৬ সালের পুজো সংখ্যার জন্য যদি কেউ চিত্তাকর্ষক কোন রচনা লেখার প্রস্তাব নিয়ে আসেন তাহলে প্রস্তাবগুলি নভেম্বর মাসের মধ্যেই আমাদের পাঠান। যুবকদের জন্য আমাদের নিয়মিত ফিচার যুবমন ৬ নভেম্বরের বদলে ১৩ নভেম্বর থেকে প্রকাশিত হবে। দিল্লির পাঠক-পাঠিকাদের জানাই, পরিবর্তন সম্পাদক ১৮ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর দিল্লি থাকছেন। যদি তাঁরা সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান দিল্লি অফিসে ফোন করতে পারেন। আপনাদের শুভ বিজয়ার অভিনন্দন জানিয়ে আজকের মত এখানেই শেষ করছি।

পা. চ.

পরিবর্তন
৬ নভেম্বর সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আততায়ী-হাতে নৃশংসভাবে খুন হবার পর এক বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে শুরু হয়েছে তাঁর হত্যাকারী এবং তাঁকে হত্যার ব্যাপারে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে মামলা। তিহার জেলের ভেতরে এই মামলা চলছে। এখানে প্রবেশাধিকার শুধু সাংবাদিক, আইনজীবী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের আত্মীয়স্বজনের। মামলার শুনানির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে বহু অজানা তথ্য। অনেকেই এই মামলার পরিণতি জানতে উদ্‌গ্রীব :

ইন্দিরা গান্ধী হত্যা-মামলা ঘিরে রহস্য ঘনিয়ে উঠছে





কলকাতা বিমানবন্দর ভারতের সেরা বিমানবন্দর। বহু বিদেশি বিমান-চলাচল কোম্পানি এই বিমান বন্দরের অকুণ্ঠ প্রশংসাও করেছে। তবু এখান থেকে সমস্ত আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সরিয়ে বোম্বে বা দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ কি স্বাভাবিক ঘটনা, নাকি এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে?

কলকাতা বিমানবন্দর : আন্তর্জাতিক সব ফ্লাইটই তুলে নেবার চক্রান্ত ?

★

ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে চোখের চিকিৎসা করাতে এসে একই দিনে চারজন এবং কয়েকদিন পর আরও একজন অন্ধ হয়ে গেছেন। শেফালী দাসপোদ্দার তাঁদেরই একজন। কার অবহেলায় এমন হল ?

ছানি কাটাতে এসে শেফালী আজ দৃষ্টিহীন

এছাড়া নিয়মিত ফিচার

এবং

ধারাবাহিক লেখা 'চীনের আকাশে নতুন তারা'

সম্পাদকীয়

চাকরিতে রিজার্ভেশনের বিরুদ্ধে গুজরাটে এতদিন যে আন্দোল· আমরা তার সমর্থক না হলেও আন্দোলনকারীদের মর্মবেদনার পারি। হাজার হাজার যোগ্য প্রার্থী যখন বেকার, তখন সংরক্ষিত পিছনের দরজা দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীরা যদি চাকরিতে ঢুকে যান তাহলে বি... দানা বাঁধতে বাধ্য। চাকরিতে সংরক্ষণ একটি বিশেষ অনগ্রসর শ্রেণীকে দ্রুত প্রাগ্রসর জনসমাজের সমপর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় তাঁদের অযোগ্য সন্তান-সন্ততিদের ভর্তি করবার জন্য যে 'কোটা'-র বাহানা ধরেছেন তা অত্যন্ত অন্যায় এবং যে কোন বিবেচক ব্যক্তির পক্ষেই নিন্দার যোগ্য। জয়েণ্ট এনট্রান্স একটি উচ্চ মানের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। প্রায় প্রতিটি অভিভাবকেরই স্বপ্ন তাঁদের ছেলেমেয়েরা এই পরীক্ষায় পাশ করুক। এই তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সন্তানদের উত্তীর্ণ করবার জন্য অভিভাবকেরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। এই পরীক্ষায় সর্বদাই যে মেরিটের বিচার হয় এমন কথা বলি না। কিন্তু একথা ঠিক, এই পরীক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পর দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও প্রভাবপ্রতিপত্তিহীন ঘরের ছেলেমেয়েরা ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে যে সাপ বেরিয়ে এসেছে তার ফলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীতের কলঙ্কিত অধ্যায় আপন স্বরূপে প্রকাশময়। হাটে হাঁড়ি ভাঙার পর এখন দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন কোটার নামে রাজনৈতিক আশ্রয়ে লালিত ট্রেড ইউনিয়নের মদতপুষ্ট নানা 'কোটা'-য় বছরের পর বছর ধরে কিছু সংখ্যক অযোগ্য ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়ে আসছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত রকমের 'কোটা' আছে। ডোনারদের কোটা, কেন্দ্রীয় সরকারের কোটা, এলামনিদের কোটা, উপাচার্যের কোটা, শিক্ষক কর্মচারীদের কোটা, অশিক্ষক কর্মচারীদের কোটা, প্লেয়ার্স কোটা। ঐসব কোটায় যারা ভর্তি হয়ে আসছিল তার মধ্যে অশিক্ষক কর্মচারীদের সন্তানদের জয়েণ্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় ৫০০ নম্বরের মধ্যে মাত্র ১০০ নম্বর পেলেই তাদের ইঞ্জিনিয়ারি...এর যে কোন শাখায় ভর্তি করে নেওয়া হয়। এই ১০০ নম্বর-এর ...বার অশিক্ষক কর্মচারীরা বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। তাঁদের দাবি ছিল, তাঁদের ছেলেমেয়েরা জয়েণ্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় বসলেই তাদের ভর্তি ক... নিতে হবে। বলা বাহুল্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্যরা যাঁরা প্রায়শই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে সভা-সমিতিতে অনেক বড় বড় কথা বলতেন, সবাই সমান— কিছু ব্যক্তি আরো সমান, এই নীতির কোন বিরোধিতা করেননি।

সমস্ত রকমের নীতি বিরোধী এই ন্যক্কারজনক 'কোটা' সিস্টেমের বিরুদ্ধে যে কোন কারণেই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের একাংশ আজ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। কায়েমী স্বার্থের পরিপোষকদের কোনদিনই শক্তি ও সংহতির অভাব হয় না। তাদের পিছনে রাজনৈতিক মদত সহজেই জুটে যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় হয়নি। পরিণামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন যে তিনি সমস্ত কোটায় ভর্তি বন্ধ রেখেছেন। এই ঘৃণ্য 'কোটা' প্রথা চিরতরে নির্মূল করে যোগ্যতার ভিত্তিতে সমস্ত ছাত্র ভর্তি প্রথা তিনি যদি পুনঃপ্রবর্তন করেন, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বড় রকমের জঞ্জাল অপসারিত হবে। এই জন্যে দরকার ছাত্রদের মধ্যেও এক সদাজাগ্রত চেতনাবোধ। বাবা কাকার জোরে প্রতিযোগিতাকে পাশ কাটিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়ার মধ্যে যে কোন আত্মমর্যাদা নেই, বরং চরম আত্ম অবমাননা—এই সত্যটি জাগ্রত ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে যদি চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিছুতেই তাঁদের সম্বিত ফিরবে না।

সাত-পাঁচ

ভারতীয় টাকার রাজত্ব

নেপালের ব্যবসায়ীরা ইদানীং খুব বিপদে পড়েছেন। সাধারণত নেপালের ব্যবসার একটা বড় অংশই ভারতের ব্যবসায়ীদের স... চলে। কিন্তু নেপালে এই ভারতীয় টাকার ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া নেপাল থেকে ভারতে আসতে গেলে কেউ ৫ হাজার টাকার বেশি আনতে পারবেন না। ব্যবসায়ীদের কাছে এটা রীতিমত খারাপ নজীর। তাঁদের মধ্যে একজন তো বলেইছেন, ৫ হাজার টাকা থাকা খাওয়াতেই ফুরিয়ে যাবে, ব্যবসা করব কী দিয়ে ?

ভারতীয় ...কার ওপর এরকম নিষেধাজ্ঞা চাপান হল কেন ? কার... র কিছুই নয়, ভারতীয় টাকা নাকি হংকং, সিঙ্গাপুর এবং ব্যাংককে অবাধে ভাঙিয়ে নেওয়া যায়। ফলে নেপালের ব্যবসায়ীরাও ভারতীয় টাকা নেপাল থেকে বের করে নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অবাধ অর্থনৈতিক মাধ্যমটির ভাঁড়ার শূন্য করে ফেলছিলেন।

তবে, নেপালী ব্যবসায়ীদের ধারণা, নেপালের সরকার অন্য একটি দেশের মুদ্রা সম্পর্কে এরকম নিষেধাজ্ঞা নাকি জারী করতে পারেন না। এ যুক্তি অবশ্য টেকে না। কারণ দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ সবসময় দেশের সরকারেরই দেখার কথা।

কয়লাশিল্পে উদ্দীপনা

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে পশ্চিমবঙ্গে কয়লাশিল্পে বিনিয়োগ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াবে ৩০০ থেকে ৫০০ কোটি এবং ১৬০০ কোটি টাকার মধ্যে। এই পরিমাণ বিনিয়োগকে বলা যায় একটা রেকর্ড। ফলে কয়লাশিল্পে পশ্চিমবঙ্গে যে একটা উদ্দীপনা আসবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুশকিল দেখা দিয়েছে অন্যত্র।

কয়লাশিল্পে জমি অধিগ্রহণ একটা বড় সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গেও সেই জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারটি রীতিমত সঙ্কট হয়ে দেখা দিতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

১৯৭৭-৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশ, এই তিনটি রাজ্য কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছিল। সে সময় তিনটি রাজ্যের মিলিত উৎপাদন ছিল ৮৫১ কোটি ৯০ লাখ টন। বিহারের হয়েছিল ৪২১ কোটি ১০ লাখ টন, পশ্চিমবঙ্গের ২৩০ কোটি ২০ লাখ টন এবং মধ্যপ্রদেশের হয়েছিল ২০০ কোটি ৬০ লাখ টন।

এ অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশিদিন থাকেনি। কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল, এ তিনটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চলে গেছে সবার নিচে। অথচ মধ্যপ্রদেশ তার উৎপাদন বাড়িয়েছে এবং বিহার তার পূর্ব উৎপাদন পরিমাণ বজায় রেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই অবনতি রোধ করার জন্যই কয়লাশিল্পে তাকে নতুন করে চাগিয়ে তোলা হচ্ছে।



পরমা ছবিতে রাখী ও মুকুল শর্মা / ফটো : হীরক সেন

আপনাদের ঐতিহ্যবাহী অন্দরমহল থেকে, 'পরমা' মুক্তি খুঁজেছে

বিচিত্র চিত্রামোদীদের নির্মম নৈতিকতার ভিড়ে পরমা যখন দ্বিতীয় এবং অসংখ্যবার অপমানিত, প্রত্যাখাত এবং পদদলিত হতে থাকে, তখন মনে হয় অপর্ণা কোন 'পশ্চিমী প্লট' আমদানি করেননি, বরং জীবন এবং শিল্পের ব্যবধান ঘুচিয়ে তাকে এমন বিপজ্জনক নৈকট্যে উত্তরিত করেছেন যে, আমরা আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত পলকা দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়ার ভয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছি। তাই এই আর্তনাদ, এমনকী, আধুনিক বুদ্ধিজীবী মহলেও সংক্রামিত।

কী আমাদের সেই ঐতিহ্য ? আর মূল্যবোধই বা কী? বংশরক্ষার নামে ভাসুর, দেবর এমনকী পরপুরুষ দিয়ে ক্ষেত্রজ উৎপাদন, স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির ভাগ রুখতে তার ভাইদের বিবাহ করা, কুলীনপ্রথার নামে হিঁদু হারেম খোলা আর বালবিধবা বা উপেক্ষিতা কোন নারীর জীবনে প্রেমের মুকুল অঙ্কুরিত হলে তাকে পরমার পিসির মত পাগল বানিয়ে দেওয়া আমাদের গতপুরুষদের অন্যতম কৃতিত্ব। এইসব নীতি-অভিভাবকরা ছিলেন চরম নির্লজ্জ এবং ভণ্ড। 'পুরুষদিগের বহু বিবাহ দোষাবহ নহে, কিন্তু নারীগণের পত্যন্তর স্বীকারে মহা অধর্ম জন্মে।' (মহাভারত, আদিপর্ব)

এই তো আমাদের ঐতিহ্য! আর তাতে পুষ্ট মূল্যবোধ? যে স্বামী সহবাসের সময় জাপানি কোলাবরেশনের গল্প করে যায়, ভেসে যাবার আগে স্ত্রী-র আকুল এস ও এস শুনে যার শুধু 'চেকে'র কথা মনে পড়ে বা নিউইয়র্ক গিয়ে যে শুধু শপিং-এর কথাই ভাবতে পারে, এমন একটি লোককেই খুব স্বাভাবিক মনে হয় আমাদের! উল্টে আমরা অনুযোগ করি, পরমা কেন এই পরিপূর্ণ স্বামীটিকে পাওয়ার পরও অতৃপ্ত! বাড়ির পুরুষদের ভালমন্দটা খাইয়ে, তাদের আয়েস আরামের সমস্ত উপকরণ যুগিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের বারমাস্যার বিনিময়ে মহত্ত্বের তথা পূর্ণতার তৃপ্তি পেতে শিখিয়েছে আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ, যা আসলে পুরুষদেরই সৃষ্টি। বস্তুত পক্ষে আমাদের সনাতন ধর্মজাত মূল্যবোধ মানুষের মুক্ত ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকার করে না। আমাদের সমাজে মানুষ কোন স্বাধীন ইচ্ছা থেকে সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পায় না। সম্পর্ক এবং তার জন্য নির্দিষ্ট মূল্যবোধ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

পরমার প্রাথমিক দ্বিধা এই মূল্যবোধের কারণেই। তাই রাহুল কাকিমা না বলায় সে আপত্তি করে। রাহুল তার ব্যক্তিসত্তাকে জাগিয়ে দিয়েছিল, তাই প্রেমিক রাহুলের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরার আকাঙ্ক্ষাতেই পরমা তার সংগে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে। স্বামীর সংগে তার সহবাস দৃশ্যের জান্তবতা,—যান্ত্রিকতার তুলনায় রাহুলের সংগে তার ঘনিষ্ঠতা অনেক মানবিক। আর সেই প্রাণস্পর্শেই জেগে ওঠে পরমার সৃষ্টিশীল মন। সেতারের ধুলো সরিয়ে পরমা আবিষ্কার করে নিজেকে।

পরমা রাহুলের মত শেকড়হীন মানুষ নয়। তাই সম্পূর্ণ উৎপাটিত হবার আগে তার স্বামী, শাশুড়ি, ছেলেমেয়ে সকলের কাছে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু তারা তাকে নির্মমভাবে প্রত্যাখান করে। তার স্বামী তাকে 'বেশ্যা' বলে। একমাত্র তখনই পরমার চোখের সামনে স্বচ্ছ হয়ে আসে সমাজ , সংস্কার, সম্পর্কের চরম স্বার্থপরতা। আর এই সব কিছু হারানর মুহূর্তে তার আত্মহত্যার চেষ্টা পরম মানবিক এবং শিল্পসম্মত।

পশ্চিমী সমাজের যৌনতা সম্পর্কিত বোধ, আবার পারিবারিক হয়ে ওঠার চেষ্টা এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতটাই আলাদা। এই



দাঁত পরিস্কারের আদর্শ সময় নব্বই সেকেন্ড। সঙ্গে আছে পছন্দসই সাতটি উপায়।* ফিজিওলজিক্যাল ডাউনস্ট্রোক, ভাইব্রেটরি অথবা বেস্, রোল স্ট্রোক অথবা প্রেস রোল, মাল্টি-টাফ্টেড, স্টিল ম্যানস্, চার্টার এবং স্ক্র্যাব। তবে, যেকোনো পদ্ধতিতে একটি নামই উপযুক্ত সাফল্য আনে--অজয় টুথব্রাশ।

উন্নত ডিজাইনে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বিশেষভাবে তৈরি। এর সুনির্মিত হ্যান্ডেল ও ব্রাশহেডের দরুন এখন আপনি, যেকোনো পদ্ধতিতেই, দাঁতের পুরো যত্ন নিতে পারবেন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এর নাইলন ৬৬ কুঁচি আপনার দাঁত পরিস্কার ও মাড়ি মালিশ তো করেই, উপরন্তু নিকোটিন, লিপস্টিক ও পানের জন্য দাঁতের ওপরকার নানান ধরনের স্থায়ী ছোপও পুরোপুরি দূর করে।

অজয় টুথব্রাশ। আপনার সারা পরিবারের উপযুক্ত, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কার্যগুণসম্পন্ন এক অনন্য টুথব্রাশ। এই প্রথম, মহিলাদের জন্যও বিশেষ ধরনের টুথব্রাশ তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত বড় বড় দোকানে পাওয়া যাচ্ছে।

উৎস:
* টরকিল ম্যাকফী ও জেফ্রি কাউলে'র এসেন্সিয়ালস্ পেরিওডন্টোলজি অ্যান্ড পেরিওডন্টিকস্। * পোলিন এফ স্টিলস্'এর ডাইমেনশনস্ অফ ডেন্টাল হাইজিন।

বিনামূল্যে

পুস্তিকা 'হাউ টু গিভ ইওর টীথ এ রিয়্যাল ক্লীন ব্রাশ।'
তাড়াতাড়ি! এই সুযোগ সীমিত সময়ের।



আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাইলন ৬৬ কুঁচি

ট্রাভেলার
ভাঁজ করে বন্ধ করার সুবিধাসহ। আপনার প্রতি সফরের সঙ্গী।

Ajay অজয় টুথব্রাশ

সারা পরিবারের উপযোগী নতুন এক কার্যকরী ব্রাশ

কলকাতার একমাত্র ডিস্ট্রিবিউটার: খিদিরপুর ট্রেডিং কোং, ৩৭/১ কার্ল মার্কস্ সরণী, কলকাতা-৭০০ ০২৩। ফোন: ৪৯-২৩৪৫।

ACIL AIL-11/85 BEN

পত্রের পরিসরে তার আলোচনা অসম্ভব। আপাতত শুধু এইটুকুই বলা যায়, আজকের পশ্চিমের প্রেমহীন যৌনতার অতৃপ্তির জুজু দেখিয়ে সনাতন অনুশাসনকে মেনে নিতে বাধ্য করা, আর বৈধব্যের যন্ত্রণা এবং সামাজিক কেলেংকারির জুজু দেখিয়ে সতীদাহের পক্ষে সমর্থন আদায় একই ব্যাপার। আজকের দিনে ভয়ংকর প্রতিযোগিতাপ্রবণ একটি উৎকেন্দ্রিক কনজিউমার সোসাইটির অন্তর্গত তীব্র বিচ্ছিন্নতার উৎস আর যাই হোক, যৌন স্বাধীনতা নয়।

রাহুল শুধু নিরুচ্চার প্রেমের ডাক দিয়ে চলে গেলে সনাতন আদর্শের সংগে তা সংগতিপূর্ণ হত সন্দেহ নেই। এই কারণেই শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নায়িকাকে কাশীবাসী করতে হয়। পরমার অনুতাপটাও আমাদের খুব কাঙ্ক্ষিত ছিল। আর এইখানেই আমাদের গোবর খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা হিঁদু মনটাও উলংগ হয়ে বেরিয়ে আসে। এটি ঘটলে পরমার স্বামী উদারতম মানুষের প্রশংসা পেতেন এবং সবার উপরে ক্ষমাশীল সনাতন ধর্মের নামে ধন্যি ধন্যি পড়ত।

এই ভণ্ড অচলায়তনের খোলা দরজার লোভকে অস্বীকার করে পরমার নবলব্ধ আত্মমর্যাদা। তারই প্রকাশ ঘটে তার অপরাধবোধহীনতায়। এইভাবেই সে প্রত্যাঘাত করে সনাতন ঐতিহ্যকে এবং একই সংগে জন্ম দেয় প্রকৃত আধুনিক নৈতিকতার।

নচিকেতা বিশ্বাস
কলকাতা – ১৫



পরমা ছবিতে রাখী/ ফটো : হীরক সেন

পরমা : অপর্ণা সেনের ইউটোপিয় জগৎ

'পরিবর্তন'-এ (১১-১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫) 'পরমা' ছবির বলিষ্ঠ, যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনার জন্য অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' ছবির সমালোচনায় আপনার ইতিহাসবোধ ও শিল্পরুচির যে পরিচয় পেয়েছিলাম তা আরো একবার প্রমাণিত হল। আপনার বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন করি। এবং প্রসংগে আরো দু'একটি কথা বলতে চাই।

পারিবারিক জীবনে সুখী, পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, ধর্মপ্রাণা, তিনটি সন্তানের জননী, উত্তীর্ণ চল্লিশ কোন মহিলার তার চেয়ে অনেক ছোট, সদ্য পরিচিত ভাসুর পো'র বন্ধুর সংগে প্রেমের নামে যৌন সংসর্গের অবাধ আয়োজন আমাদের কাছে পারভার্সান ছাড়া কিছু নয়। যদিও পরিচালিকা অপর্ণা সেন একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'পরমার কাহিনী আমি লিখেছি আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস থেকে।'– পরিচালিকার এই বিশ্বাস ও উপলব্ধির ইউটোপিয় জগৎ আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। আমাদের বাড়ির কোন কাকিমা বা ঐ শ্রেণীর কোন মহিলা তার চেয়ে অনেক ছোট কোন অপরিচিত পুরুষের নাম ধরে ডাকাটা কি মেনে নেবেন? রাহুল পরমাকে স্বচ্ছন্দে 'পরমা' বলে ডাকে। এবং পরমার এই সম্মতিদান থেকেই বাস্তবতা উড়ে যায়, ছবিতে আসে অপর্ণা সেনের ইউটোপিয় বাস্তবতা।

ছবিতে আরো একটা গণ্ডগোল আছে। শীলা নারী স্বাধীনতার প্রতীক। সে সিগারেট ছাড়া কথা বলে না। ডিভোর্সি। প্রগতিশীল। অথচ পরমাকে পাঁচশো টাকা ধার দেবার সময় পরমার বালা জোড়া সে রেখে দেয় মৃদু হেসে। এর মানে কী হয় জানি না। সাধারণভাবে, বাঙালি পরিবারে শাশুড়ি বলতে আমরা যা বুঝি পরমার শাশুড়ি তার চেয়ে আলাদা। রাহুলের ছবি তোলার ব্যাপারে পরমার প্রাথমিক আপত্তি থাকলেও তাঁর কোন আপত্তি নেই। শুধু তাই নয়, পরেও যখন দুপুরবেলায় পরমা শীলার কাছে যাবার নাম করে বের হয়, তখন তিনি আপত্তি জানান না। পরমা রাহুলকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছে এ বাড়ির সবাই খুব ভদ্র। কেউ কারো চিঠি খুলে দেখে না। তাহলে পরমার অপূর্ণতার জায়গাটা কোথায়?

আসলে ভ্রান্ত জীবনবোধ থেকেই এ ছবির জন্ম, তাই সবই সম্ভব। যে দেশে খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই বধূ হত্যার ঘটনা চোখে পড়ে, নারী যেদেশে আজও পণ্যের মতই বিক্রি হয়, যে দেশে তিরিশ পেরিয়ে যাওয়া অবিবাহিতা মেয়েদের স্বাধীনভাবে বাঁচার ইচ্ছেকে নিয়ে টিপ্পুনি কাটা হয়, রবিবারের 'পাত্র পাত্রী' বিজ্ঞাপনে 'খুঁত-যুক্ত পাত্রও চলিবে' – এমন কথার মধ্যে দিয়ে সমাজে নারীর স্থান কোথায় সে বিষয়ে একটা ভয়াবহ ছবি পেয়ে যাই আমরা, বেঁচে থাকার তাগিদে আজও যখন নারীকে নিজের শরীর পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, সেই দেশে নারী-স্বাধীনতার লেবেল এঁটে অপর্ণা সেন আমাদের উপহার দিলেন 'পরমা'র মত ছবি। হায়, নারী স্বাধীনতা!

আরো একটি কথা। আপনি বেরসিকের মত প্রশ্ন করেছেন : এ ছবি শিশুরাও দেখতে পারে? – নিশ্চয়ই। শিশু, কিশোর, যুবক, তার বাবা-মা সবাই একসংগে দেখবে বৈকি? আমাদের আগামী প্রজন্মের কোন নারী যাতে কাকিমা, মা, বোন, বৌদি না হয়ে, শুধু নারী হিসেবে যৌন স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে সেইজন্যেই তো 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' ছাপ নেই।

সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৪১



ফটো : সিরাজুল মনির

সিউড়ীতে 'পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ কমিটি'র সভা

বেশ কিছুদিন ধরে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ীতে সাহিত্যের আড্ডা বা মজলিস থিতিয়ে পড়েছিল। তাই যাতে এই শহরে আবার নতুন করে সাহিত্যের আড্ডা জমে ওঠে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে পরিবর্তনের নিয়মিত পাঠকদের নিয়ে 'পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ কমিটি' গঠিত হল। এই কমিটি কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমালোচক, সংগীত শিল্পী, আলোকচিত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, পুলিশ, সমাজসেবক – সব ধরনের পাঠকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার ফলে গঠিত হয়েছে।

এই কমিটি তৈরির মূল উদ্দেশ্য হল 'পরিবর্তন'-এ প্রকাশিত লেখাগুলির উপর আলোচনা করা। কীভাবে এই জনপ্রিয়, বহুলপ্রচারিত সাপ্তাহিকটিকে আরও আকর্ষণীয় করা যায়, পাঠকরা কী ধরনের লেখা পরিবর্তন-এ পেতে চান, প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্যই এই কমিটি গঠন।

এই উপলক্ষে 'পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ কমিটি'-র প্রথম আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, সন্ধ্যা ৭-টায়, সিউড়ী শহরে পরিবর্তন-এর এক সহৃদয় পাঠকের ঘরে। আলোচনা সভার পরিবেশ ছিলো অতি মনোরম। খারাপ আবহাওয়ার জন্য প্রথম সভাটিতে সদস্যদের উপস্থিতি সংখ্যা ছিল কম।

পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ কমিটি'তে যাঁরা আছেন :

প্রতিষ্ঠাতা : সুব্রতকুমার মুখোপাধ্যায় ও ইয়াসিন আখতার

উপদেষ্টা : ডঃ সুধীর করণ

সভাপতি : কবিরুল ইসলাম

সহ-সভাপতি : এ মান্নাফ

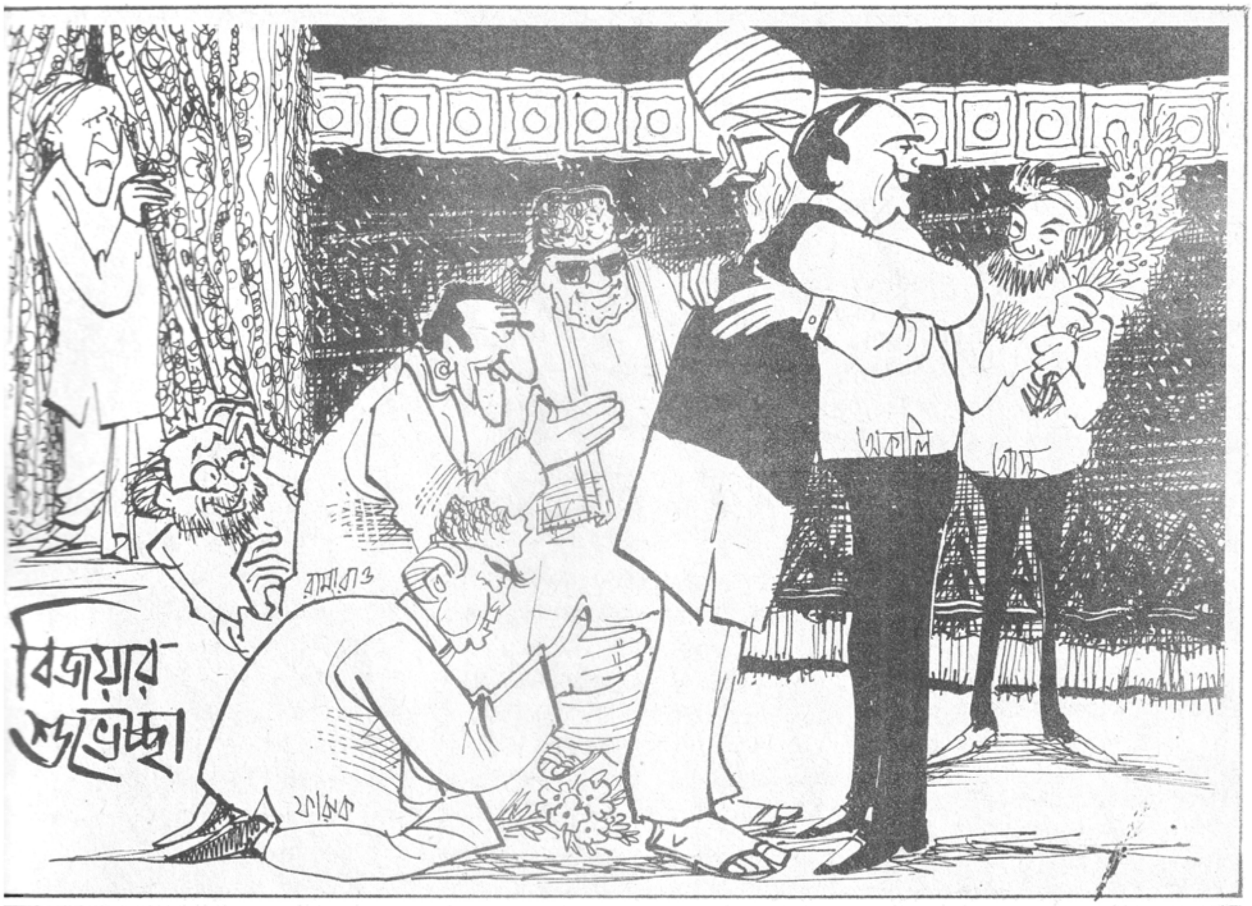
যুগ্ম-সম্পাদক : সুব্রতকুমার মুখোপাধ্যায় ও ইয়াসিন আখতার

সহ-সম্পাদক : রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ : উদয়ন ভট্টাচার্য

সদস্য : স্বপ্না চৌধুরী, অর্ণব মজুমদার, সিরাজুল মনির, অসিতকুমার সাউ, অজিত ঘোষ, রামচন্দ্র দে, বুদ্ধদেব মজুমদার, মানসী মুখার্জি, মুজিবর রহমান, সাবিত্রী ভট্টাচার্য, ডাঃ অরুণ দাস, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, মালা মুখোপাধ্যায়, রীণা দাস এবং সোমা গাংগুলি।

সুব্রতকুমার মুখোপাধ্যায়
ইয়াসিন আখতার
সিউড়ী



অম্লমধুর

গিন্নী বলেন, একটা ভাল,
একটা অর্ডিনারি,
কন্যা বলে, একটা জামা



একটা ভাল শাড়ি
আমার চাই দুখানা সেট
পুত্র জানায় সাফ
কর্তা বলেন, ঘুরছে মাথা,
রক্তে বাড়ে চাপ।

★

চাইনিজ হোটেলে
রোজ যদি নিয়ে যাও,
দাও যদি ফিশফ্রাই,
চাওমিন, চাউ চাউ,
সন্দেহ নেই তিল
তোমারই যে থাকব,
যতদিন পারো তুমি,
তার পরে ভাগবো।

★

এই যে দাদা—
মায়ের পুজো,
কাটব কত,
মাত্র দুশো!
ঠাট্টা নাকি,
কি যে বলেন?
গত পুজোয়
চারশো দিলেন!

সৃজন পাল

মোক্ষ এবং মক্ষি খুঁজে
হবু যতেক এক দুজে
মায়ের কাছে বিনতি করে
করুণ এবং রাগের স্বরে
বাড়ির লোকের চোখ এড়িয়ে
পথে অনেক কাঁটা সরিয়ে
এ কটা দিন ব্যস্ত মোরা
কত হৃদয় ভাঙাগড়া
আর কটা দিন থাক নাগো
কেন এত জলদি ভাগো
আই বুড়ো তিন ছেলেমেয়ে
চিন্তা তো নেই তাদের নিয়ে
বুঝলে পরে তাদের ব্যথা
শুনতে পেতে মোদের কথা।

বিশ্বজিৎ রায়

ওই হিতেশ্বর সইকিয়া
কইলেন গুয়াহাটি গিয়া,
একটা কথা পরিষ্কার ঃ



'একাত্তরে আইছেন যারা
হগ্‌গলে যে গো 'বিদেশি' তারা
করুম তাগো বহিষ্কার।'

নির্মল বিশ্বাস

পুলিশ পুলিশ করে সবাই
হাঁকে যখন জোরে,
পুলিশ ভাবে এখন না থাক—
গুণ্ডাটা যাক সরে।।
ওদের আছে বোমা ছোরা
আমিই যদি যাই মারা
তখন তো আর পুলিশ বলে
করবে কদর কারা।।
সব কিছু যেই লুটে পুটে গুণ্ডা গেল
চলে
বীরপুঙ্গব পুলিশ তখন বলে, গালি
দিয়ে
ব্যাটারা সব ভয়ে ভয়ে গেল
কোথায় চলে।।

নির্মলেন্দু রায়মণ্ডল

নেতাদের বুলিগুলো সস্তা
পাকা হবে ক্যানিং-এর রাস্তা
থাকবে না পথে কাদা
বলেছেন কত দাদা,
তবু দেখি, রাস্তার বুকে বড় ক্ষত
জঞ্জালে পূর্ণ বাজারের পথ।

রাখাল চন্দ্র দাস

শুধুই শুনি আশার কথা,
বেকার গুলান হইবো সকার
ওখানেতে এক লাখ,
কলে নিমু দুই লাখ
দিন যায়, মাস যায়—
শেষ হয় বৎসর।
তারি মাঝে আসে ভাই,
নয়া এক সরকার।

শ্রীকুমার সেনশর্মা

স্বর্গ সংবাদ

আজ ২৩ অক্টোবর। বিজয়া দশমী। দুর্গা সদলে আজ সন্ধের ফ্লাইটে স্বর্গে যাবেন। বিমানবন্দরের ভি আই পি লাউঞ্জে বিভিন্ন কাগজের রিপোর্টাররা তাঁদের ঘিরে ধরলেন।

: আচ্ছা মিঃ কার্তিক, এবারে কলকাতা কীরকম লাগল ?

প্রশ্নের উত্তরে কার্তিক বললেন, সো সো। নাথিং নিউ। তবে তোমরা বহুকাল পরে কর্পোরেশন ইলেকশন করে পৌর পিতা পেয়েছো, তা ব্যাপারটা খুবই রিমার্কেবল। আমাদের স্বর্গ সভায়ও বহুদিন নির্বাচন বন্ধ। কোন পৌর পিতা নেই। ব্রহ্মা বুড়ো হয়েছেন, কিছুই করতে পারছেন না, তবু গদি ছাড়বেন না। আর আমার ফাদারের কথা আর বল না। তাঁর গাঁজাতে আর শানাচ্ছে না। মর্তে প্রতি বছর শিবরাত্রির দিন এসে মারিজুয়ানা, হেরোইন এসব চোরা বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। আর সেগুলো সেবন করে সবসময় বুঁদ হয়ে বসে আছেন।

: দ্যাখ কেতো, বাপের নামে নিন্দে করিস না। গণেশ গর্জে উঠল।

: আরে রাখ রাখ, যে বাপের পার্সোনালিটি নেই, তাকে আমি কেয়ার করি না। স্বর্গীয় দল তো এখন কতকগুলো বুড়োর আড্ডা।

কথাটা কানে যেতেই মা দুর্গা ফুঁসে উঠলেন,—রিপোর্টারদের সামনে বাপের নিন্দা করতে তোমার লজ্জা করছে না কাতু ?

: লজ্জা কীসের ? আমাদের ইনার পার্টি ক্ল্যাশের কথা সবাই জানে। এখানে মর্তে বাম সমিতি সরকারকে যতই গালাগাল দাও তবু তারা কাজ করছে। আর আমরা স্বর্গীয় দলের জন্যে একটা প্রেসিডেন্টই পেলাম না।

লক্ষ্মী ছোট্ট আয়নাটা মুখের সামনে ধরে লিপস্টিক লাগাতে লাগাতে বললেন—কেন, নারদ-কাকুকে তো প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। আর তা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ এখন আমাদের একজন পজেটিভ লিডার। কীরকম সুদর্শন চক্র ছাড়ছেন। কাটছেও কচাকচ কচাকচ।

সরস্বতী বললেন, থাম তুই, আর শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিস না। ও'র মহৎ গুণ, উনি হ্যাণ্ডসাম।

: দেখিস দিদি, তুই যেন আবার বীণা ছেড়ে বাঁশি ধরিস না।

গণেশ চেঁচিয়ে ওঠে : কী হচ্ছে সাংবাদিকদের সামনে। আঃ, ডোণ্ট বি সিলি!

শ্রীদুর্গা বললেন—গায়ে মর্তের হাওয়া লেগেছে আর কী।

একজন রিপোর্টার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা শুনছি নাকি রম্ভা, মেনকা, উর্বশী এ'রা স্বর্গে পলেটিক্সে আসছেন ?

শ্রীদুর্গা : মর্তে ফিল্মস্টারদের রাজনীতিতে আসা দেখে ওরাও বায়না ধরেছে।

একজন রিপোর্টার কার্তিককে জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা যমরাজকে নাকি আপনারা মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসছেন ?

কার্তিক : হ্যাঁ, খবরটা সত্যি। প্রথমে ভাবা হয়েছিল শিশু পালন দপ্তরের ভার ও'র হাতে দেওয়া হবে। কিন্তু অনেকে আপত্তি করছে। বলছে কচি কচি মাংস খাবার জন্যে যমকে ঐ দপ্তর দেওয়া হবে ? কিন্তু আমার ইচ্ছে যমরাজকে শুধুমাত্র একটা ক্যাবিনেট মিনিস্টার না করে ও'কে ব্রহ্মার পদে বসান উচিত।

রিপোর্টার : তাহলে কি গণতন্ত্রের টুঁটি টেপা হবে না ?

কার্তিক : তা হয় হোক। আপনারা কি জানেন যে, স্বর্গে মহিষাসুর বৈরী মহিষ দল বলে একটা পার্টি তৈরি করছে ? সারা স্বর্গ তারা তছনছ করে বেড়াচ্ছে। হাজার হাজার উদ্ধত শিংওয়ালা মোষ নিয়ে তারা বৈকুণ্ঠ ময়দানে একটা জমায়েত করেছিল। তাদের দাবি—বিভিন্ন স্বর্গীয় কমিটিতে তাদের প্রতিনিধিরাও থাকবে।

: এতদিন কি ছিল না ?

: না। এতদিন আমার বাবার বাহন ষাঁড়রাই বহাল ছিল।

: শুনেছি ষাঁড়ের বুদ্ধির চেয়ে মোষের বুদ্ধি নাকি সরেস ?

কার্তিক উত্তর দেবার আগেই সিংহ বীরবিক্রমে রিপোর্টারদের বললেন—ওঁরা দুই-ই সমান গ রিপুটার বাবু। যত গরু আর ষাঁড়ে মিলে বড় বড় পোস্ট নিয়ে বসে স্বর্গটাকে একেবারে উচ্ছন্নে দেবে—আর আমি হেন সিংহরাজ, যার 'বল' ও 'বুদ্ধি' দুই-ই আছে, অথচ আমার স্থান চিরকাল ঐ মায়ের পায়ের তলায়!

গণেশ বলল : তোমার হাতে ক্ষমতা দিলে তো তুমি সামরিক আইনের জোরে স্বর্গে ডিক্টেটরশিপ চালু করবে। তাতে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে।

সিংহ : ওহ, কী আমার গণতন্ত্রের পূজারী রে। ঐ ষাঁড়-গরু দিয়ে দেশচালনার চেয়ে ডিক্টেটরশিপ অনেক ভাল।

রিপোর্টার : আচ্ছা মিঃ সিংহ, আপনি একথাটা বর্তমান শাসক শ্রীকৃষ্ণকে বলতে পারেন ?

সিংহ : ওনাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আজ যে আপন কাল সে পর। আর ভীষণ কান-পাতলা। দেখলেন না, নারদের কথা শুনে নিজের ছেলে শাম্বকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বেচারার এখন কী হাল! শাম্ব একজন নির্দোষ ভদ্রলোক। দেখলেন না, বৃন্দাবনে রাধাকে নিয়ে ফুর্তি-ফার্তি করে বেমালুম তাঁকে ভুলে গেলেন।

রিপোর্টার : ওটা তো তাঁর লীলা।

সিংহ : সবই তো তাঁর লীলা! জেনে রাখবেন দেশ শাসনে লীলার কোন স্থান নেই। মনে রাখবেন, ষাঁড়-মোষের দল নিয়ে দেশ চলবে না। একদিন আমাকে ডাকতেই হবে।

এমন সময় মহিষাসুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। একজন রিপোর্টার জিগ্যেস করলেন—আপনি নাকি স্বর্গে নতুন দল গড়েছেন!

: নিশ্চয়। গড়ব না ? যদিও আমরা স্বর্গে মাইনরিটি কমিউনিটি, কিন্তু চিরকাল তা থাকব না। আমাদেরও অনেক দাবি আছে। আপনারা আমাকে মর্তে দেখেন বছরে চারদিন মা দুর্গার ফ্রি-কিক খাচ্ছি, স্বর্গে এটা রোজের ব্যাপার। অথচ এ'রাই মুখে গণতন্ত্রের কথা বলেন। ঐ হাতিমুখোটা (মহিষাসুর একবার গণেশের দিকে তাকালেন) কালো টাকার সিদ্ধি দিয়ে বেড়াচ্ছেন একে তাকে আর মুখে লক্ষ্মীকে ধমকাচ্ছেন—'তে ভুল ইকনমিক পলিসির জন্যে রাজ্যে কালো টাকা ...ড়ছে'। আমার পার্টি এসবের বিরুদ্ধে লড়বে।

রিপোর্টার : কিন্তু এতে করে কি বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দেবে না ?

মহিষাসুর গোঁফে তা দিয়ে বললেন—এই হচ্ছে মিডলক্লাস সেণ্টিমেণ্ট। শুনুন, আমরা হলাম ট্রাইবাল কমিউনিটি, কোন ধর্মীয় জিগির তুলে আমরা আন্দোলন করব না স্বর্গে, তাই বিচ্ছিন্নতাবাদের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর শ্রীকৃষ্ণ যদি আলোচনার টেবিলে বসেন, মা দুর্গা যদি তাঁর ফ্রি-কিক বন্ধ করেন—তবে আমরাও দল গড়া থেকে বিরত থাকব।

এমন সময় মাইকে একটি নারীকণ্ঠ শোনা গেল—অ্যাটেনশন প্লিজ! প্যাসেঞ্জারস অব ফ্লাইট নং আই টি ০০১ আর রিকোয়েস্টেড টু কাইণ্ডলি পসিড টু দি সিকিউরিটি এনক্লোজার।

মা দুর্গা হাত তুলে রিপোর্টারদের বললেন—বাই। □

সৌরেন মিত্র

কংগ্রেসে থাকতে হলে সুব্রত মুখার্জিকে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে

নিশীথ দে

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস রাজনীতির টিকি প্রায় এক দশক ধরে দিল্লির কাছে বাঁধা। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর এ রাজ্যের কংগ্রেস রাজনীতি সরু সুতোয় ঝুলছে। কে কখন চেয়ার পাচ্ছে, কখন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বোঝা মুশকিল। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিকল্প খুঁজতেই চার বছর কেটে গেছে!

প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস সভাপতি রাজীব গান্ধী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে বসালেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে। প্রণববাবুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়াটা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি বিস্ময়কর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়াটা। তার আগে বহুদিন জল্পনা-কল্পনা চলছিল প্রণববাবুকে আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নেওয়া হচ্ছে। অবশ্য পরে যখন গনি খান চৌধুরী এবং অজিত পাঁজাকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়েছে, তখনও শোনা গেল রাজীব গান্ধী প্রণববাবুকে প্রদেশ কংগ্রেস থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা ওইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ দফতর দিতে পারেন। রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। হঠাৎ অনেক কিছু ঘটতে পারে। প্রয়াত জওহরলাল নেহরু তাঁর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন কৃষ্ণমেননকে সরিয়ে দিয়ে ওয়াই বি চবনকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করেছিলেন। সব কিছু নির্ভর করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপর।

কিন্তু সত্যিই কি প্রণববাবুকে দিয়ে রাজীব গান্ধী প্রদেশ কংগ্রেস সংগঠন করতে চেয়েছিলেন? নাকি তিনি সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না—সেরকম একটা কিছু করতে চেয়েছিলেন? রাজীব গান্ধীকে বোঝান হয়েছিল, প্রণববাবু ঠিক কোন গোষ্ঠী রাজনীতি করেন না। মোটামুটিভাবে সবাইকে নিয়ে চলতে পারেন। রাজীব রাজি হলেন, কিছু আশাবাদীকে হতাশ করার জন্যে। ৩ এপ্রিল প্রণববাবু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হলেন। ২২ এপ্রিল প্রদেশ


প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী

কংগ্রেসের নতুন কর্মসমিতির বৈঠক হল। বৈঠকে যা হল তা নিতান্তই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি। সামনে কলকাতা পুরসভা নির্বাচন। আসরে নামলেন অশোক সেন, হাইকম্যাণ্ড নামালেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে, নেপথ্যে রইলেন গনি খান চৌধুরী। প্রণববাবু যেভাবেই হোক অশোক সেনের সঙ্গে প্রকাশ্যে সংঘাতে গেলেন। সিদ্ধার্থ রায়ের আবির্ভাবকে মেনে নিতে পারলেন না।

রাজীব গান্ধীর কাছে খবর গেল, প্রণববাবু সুব্রতকে নিয়ে চলছেন। দুই সাধারণ সম্পাদক প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী এবং অজিত পাঁজাকে সুব্রতর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন না; কাজ করার সুযোগ দিচ্ছেন না। প্রণববাবুর অতিরিক্ত সুব্রত প্রীতির জন্য অনেক প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীই সরে গিয়েছেন। সেই ২২ এপ্রিলের মিটিং থেকেই মাঝ পথে বেশ কয়েকজন প্রবীণ নেতা চলে গিয়েছিলেন। তাঁদের একজন মন্তব্য করেন, 'প্রণববাবু নতুন নাটকের রিহার্সাল দেওয়াচ্ছেন।'

কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেস হেরেছে। প্রণববাবু তারপরও সুব্রতকে মদত দিয়েছেন। রাজীব গান্ধী চেয়েছিলেন, প্রণববাবু যেন রাশ টেনে ধরেন, যাতে সুব্রত বাড়াবাড়ি করতে না পারেন। ১২ সেপ্টেম্বর সিটুর সঙ্গে আই এন টি ইউ সি-র বন্‌ধ ডাকা নিয়ে কংগ্রেসে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল।

সুব্রতবাবুকে আই এন টি ইউ সি সভাপতি জি রামানুজম ডেকে পাঠালেন। রাজীব গান্ধীর কঠোর মনোভাব সুব্রতকে রামানুজম পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন। সুব্রত প্রণববাবুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বন্‌ধ-এর সাফল্যে সুব্রত শ্রমিক কর্মচারীদের অভিনন্দন জানালেন, প্রণববাবু মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং সিটু নেতা মনোরঞ্জন রায়কে অভিনন্দন জানালেন, রাজীব গান্ধীর কানে সব খবর পৌছল একটু অতিরঞ্জিত করে।

এরপর যা ঘটল তা সবারই জানা। দিল্লিতে প্রণববাবু আটদিন অপেক্ষা করলেন, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দেখা করলেন না। সুব্রতবাবু এবং সোমেন মিত্রকেও রাজীব ডাকলেন না।

তারপর প্রণববাবুর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করা হল। প্রণববাবুর আগে প্রিয়রঞ্জনকেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করা হবে বলে সব ঠিক হয়েছিল। কিন্তু করা হয়নি শুধু এই ভেবে যে, প্রিয়রঞ্জন দু বছর আগে কংগ্রেস (স) থেকে এসেছেন। এখনই সভাপতি করা হলে গোলমাল হতে পারে।

প্রিয়রঞ্জন কংগ্রেসে ফিরে এসেছিলেন সরাসরি রাজীব গান্ধীর সঙ্গে কথা বলে। এরপর রাজীবের পরামর্শ মত চলেছেন। অত্যন্ত সংযত হয়ে চলেছেন। কোনরকম বিবৃতির লড়াই-এ যাননি।

প্রণববাবুর প্রস্থান এবং প্রিয়রঞ্জনের প্রবেশের পর সবচেয়ে সঙ্কটে পড়লেন সুব্রত। দিল্লির নেতারা খড়্গহস্ত। নতুন মন্ত্রী অজিত পাঁজা কিংবা গনি খান চৌধুরী কারুর সঙ্গে সুব্রতর সম্পর্ক ভাল নয়। প্রণববাবুর আর প্রোটেকশন দেবার ক্ষমতা নেই। এখন সুব্রত কী করবেন? সভাপতি হয়ে প্রিয়রঞ্জন যদি বলতেন, সুব্রতবাবু দলের শৃঙ্খলা নষ্ট করেছেন, সুব্রতবাবুকে শো কজ করা হবে, তাহলে সুব্রতর সুবিধা হত। কিন্তু প্রিয়রঞ্জন অন্তত প্রকাশ্যে যে সংঘর্ষের পথে যেতে চাননি সেটা প্রমাণ করলেন সবার আগে সুব্রতর সঙ্গে বৈঠক করে। বাড়িতে সুব্রতর জন্যে প্রিয়রঞ্জন ডিনার পার্টি দিলেন।

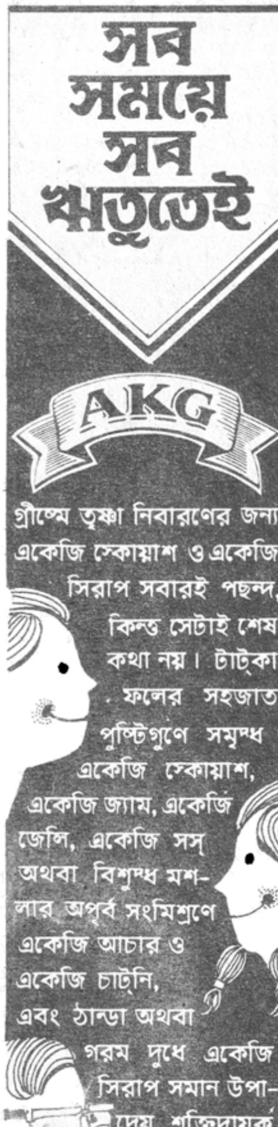
হঠাৎ একদিন রাত একটার সময় সুব্রত লাউডন স্ট্রিটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশোক সেনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। ব্যারিস্টার অশোক সেন অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। সুব্রতর সঙ্গে অনেকদিন থেকে ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল। অশোকবাবু তাঁর দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে বলেছেন, সুব্রত আমার ছেলের মত। সুব্রত বলেছে, প্রণববাবুর নির্দেশ মতই ও কাজ করে গিয়েছে।

কিন্তু তাতেও কি সুব্রত বাঁচবেন? আই এন টি ইউ সি-তে সুব্রতর যাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁদের সঙ্গেও তো সম্পর্ক ভাল নয়। সুব্রতর সঙ্গে সিটুর ইউনিয়নের সংঘাত এখন কম, বরং আই এন টি ইউ সি-র অনেক ইউনিয়নে সুব্রতর সমর্থকদের সঙ্গে রীতিমত সংঘর্ষ চলছে। আই এন টি ইউ সি-র অফিসে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটেছে যাতে সুব্রত সেখানেও তাঁর একাধিপত্য রাখতে পারছেন না।

প্রণববাবু চুপচাপ রয়েছেন। প্রণববাবুর সুব্রতর উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ও ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে প্রণববাবুর নিজের কোন বেস নেই, বেস আছে সুব্রতর। তবে সুব্রতর খামখেয়ালিপনা, সব কিছুতে সায় দেওয়াটা মারাত্মক ভুল। কারণ, প্রণববাবুর বোঝা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাঁর দু নম্বর স্থান হলেও লবি জোরদার ছিল না, কোন গোষ্ঠীও ছিল না। প্রণববাবু হয়তো স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাটাবেন—'ওয়েট অ্যাণ্ড সি' কৌশল ছাড়া উপায় নেই। সুব্রতবাবুকে কংগ্রেসে থাকতে হলে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস যেভাবে চলেছে তাতে বিনা মূলধনে সুদ ভোগ করছে সি পি আই (এম) □

৫.১০.৮৫



পলিক্লিনিক—২

সিরোসিস অব লিভার

সিরোসিসের নামেই অনেকে আঁৎকে ওঠেন। হ্যাঁ, সিরোসিস অব লিভার এরকমই একটি শক্ত অসুখ। এই অসুখে লিভারের কিছু কিছু কোষ একদিকে যেমন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়, বাকি জীবিত কোষগুলোর তেমনি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। ফলে, লিভারটিই হয়ে ওঠে বেঢপ সাইজের। এই নতুন লিভারের স্বাভাবিকভাবেই আর আগের কর্মক্ষমতা থাকে না। এবং শরীরে রক্ত-সঞ্চালনজনিত বাড়তি ঝামেলা ডেকে আনে।

বেশির ভাগ লোকই অ্যালকোহলকে সিরোসিসের কারণ হিসাবে জানেন। কিন্তু অ্যালকোহলই কেবল নয়, আরও কয়েকটি জিনিস এই সিরোসিসের জন্য দায়ী। কেউ কি বিশ্বাস করবেন যে, হরহামেশা কাউন্টার থেকে আমরা যেসব সাধারণ ওষুধপত্র কিনে খাই, তাদের অনেকেরই লিভার নষ্ট করার ক্ষমতা রয়েছে? এক ধরনের ভাইরাল হেপাটাইটিস থেকেও এই অসুখ হয়।

সিরোসিস দুরারোগ্য ব্যাধি। কিন্তু শুরুতেই যদি এই অসুখ ধরা পড়ে, তাহলে রোগী অনেক ক্ষেত্রেই আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ ডি কে রায় সিরোসিসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন।

প্রশ্ন ঃ সিরোসিসের প্রধান কারণ কী কী?

উত্তর ঃ অনেক কারণে সিরোসিস হতে পারে। তবে প্রধান কারণ দুটি ঃ অ্যালকোহল এবং ভাইরাল হেপাটাইটিস। ভাইরাল 'বি' হেপাটাইটিস থেকে তো সিরোসিস হামেশাই হচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই জানাই—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু সিরোসিসের কারণ আমরা জানি না।

প্রশ্ন ঃ রোজ কতটা করে অ্যালকোহল খেলে সিরোসিস হতে পারে?

উত্তর ঃ দেখা গিয়েছে, রোজ আশি গ্রাম করে অন্তত ৫ থেকে ১৫ বছর অ্যালকোহল খেলে সিরোসিস হয়। নির্ভেজাল অ্যালকোহলের কথা এখানে বলছি। যদি অ্যালকোহলে অন্য জিনিস মেশানো থাকে—আমাদের দেশি মদে যেটা খুবই হচ্ছে—তাহলে এর চেয়েও কম মাত্রায় কম দিন খেয়ে সিরোসিস হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ অপুষ্টির সঙ্গে সিরোসিসের কি কোন সম্পর্ক আছে?

উত্তর ঃ জীবজন্তুর বেলায় এটা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, অ্যামাইনো অ্যাসিডের অভাবে তাদের সিরোসিস হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে অপুষ্টি থেকে সিরোসিসের কোন প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বাচ্চাদের একটি অসুখ আছে, কুয়াসিঅরকর, শরীরে প্রোটিন ঘাটতির জন্য এটা হয়, এই অসুখেও লিভারে কোন Cirrhotic পরিবর্তন পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ঃ সিরোসিসের জন্য কয়েকটি চালু ওষুধকেও দায়ী করা হয়। এ প্রসঙ্গে যদি কিছু বলেন—

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কয়েকটি ওষুধ সত্যিই লিভারের পক্ষে ক্ষতিকর। ব্লাড প্রেসারের ওষুধ মিথাইল ডোপা, ব্যথা-বেদনানাশক ফিনাইলবুটাজোন, সালফোনামাইড ইত্যাদি এই ধরনের ওষুধ। এগুলি দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে সিরোসিস হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ সিরোসিসের লক্ষণ কী কী? মানে, কী কী কষ্ট হলে কোন রোগী ডাক্তারকে দিয়ে চেক-আপের দরকার মনে করবেন?

উত্তর ঃ প্রথমদিকে রোগীর সকালে উঠে কোন খিদে হয় না, গা বমি বমি করে পেটে গ্যাস হয়, পাতলা পায়খানা হয়, শরীরে ভীষণ দুর্বলতাবোধ। এরপরে দেখা যায়, পায়ের চেটো ফুলছে—বিশেষত সন্ধ্যাবেলার দিকে। এরপরে পেট ফোলে! পেচ্ছাপের পরিমাণ কমে আসে। অনেক সময় দেখা যায়, রক্তবমি হচ্ছে, বা আলকাতরার মত পায়খানা। সামান্য জণ্ডিসও থাকতে পারে। সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা হল—**Hepatic Coma**, সিরোসিসের সবচেয়ে বাড়াবাড়ি অবস্থা। শতকরা ৯৯ জনই মারা যায়।



ডাঃ ডি কে রায়, ফটোঃ অমিতাভ সান্যাল

প্রশ্ন ঃ চিকিৎসায় সিরোসিস রোগীর ভাল হবার সম্ভাবনা কেমন?

উত্তর ঃ এটা নির্ভর করে আমরা কত তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় করতে পারছি তার ওপর। অ্যালকোহলিক সিরোসিসের কথাই ধরুন। এটা যদি সদ্য সদ্য ধরা পড়ে, তাহলে রোগীকে অ্যালকোহল বন্ধ করিয়ে এবং অন্যান্য চিকিৎসাপত্র দিয়ে আমরা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারি। কিন্তু 'বি' হেপাটাইটিস থেকে যে সিরোসিস, সেখানে **Post-necrotic Scarring** হওয়ার দরুন লিভারকে কিছুতেই আর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। অন্যান্য সিরোসিসের ক্ষেত্রে আমরা রোগীকে বিশ্রাম, উন্নতমানের প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদি দিয়ে নিশ্চয়ই ভাল করতে পারি।

প্রশ্ন ঃ বাজারে লিভারের ওষুধের তো ছড়াছড়ি। নামী-দামী কোম্পানির বিজ্ঞাপন ও প্রতিনিধিরা এসব ওষুধের সওদা করেন এই বলে যে, এগুলির লিভার ঠিক করার ক্ষমতা রয়েছে। এই ওষুধগুলির কি এরকম কোন ভূমিকা আছে?

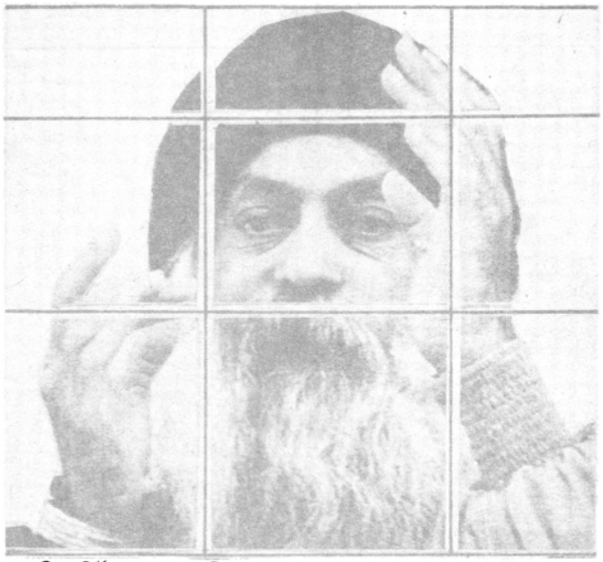
উত্তর ঃ না, নেই। এরকম কোন ওষুধই নেই, যা মৃত লিভার-কোষকে আবার প্রাণ দিতে পারে। লিভারের চিকিৎসা মূলত **Supportive.** সিরোসিসই বলুন, আর ভাইরাল হেপাটাইটিসই বলুন, কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। □

সাক্ষাৎকার ঃ মৃণাল বসু



দই হবে তো এমন...
মাদার ডেয়ারীর মিষ্টি দই-
একেবারে পুরানো দিনের মতোই
খাঁটি দুধের স্বাদ
আর পুষ্টিতে ভরা
মিষ্টি দই
মাদার ডেয়ারীর সুগম মিষ্টি দই একেবারে খাঁটি দুধের তৈরী। যেমন ভালো খেতে, তেমনি উপকারী। হবেই তো— খাঁটি দুধের সব গুণই যে এতে আছে। তার ওপরে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরী। আর গুণমানের কোন হেরফের হয় না।
কেবল মাদার ডেয়ারীই পারে এমন দই তৈরী করতে। আচ্ছা, সব দই এমন হয় না কেন?
শুধুমাত্র কলকাতা ও শহরতলীতে পাওয়া যায়।
বড় অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
মাদার ডেয়ারী, পোঃ চাকুণ্ডি
জেলা ঃ হুগলী, পিন ঃ ৭১২ ৭০২
ফোন ঃ ৬৪ ৩৫৭৮–৭৯
মাদার ডেয়ারী, ১১/১এ, রডন স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০১৭
ফোন ঃ ৪৪ ০৬৩৯, ৪৩ ৫৬৮২
৫০০ গ্রাম এবং ১০০ গ্রাম পলিস্টাইরিন প্যাকে মাদার ডেয়ারীর কিছু কিছু বুথ এবং অনুমোদিত ডীলারের কাছে পাবেন।
খাঁটি দুধের স্বাদে ভরা, স্বাস্থ্যগুণে নেইকো জোড়া
CLARION C—MDMD-1

প্রচ্ছদ কাহিনী



বিতর্কিত গুরু রজনীশের প্রধানা শিষ্যা মা আনন্দশীলাসহ ২০ জন সদস্য সম্প্রতি রজনীশের আশ্রম ছেড়ে চলে গেছেন। রজনীশ এঁদের বিরুদ্ধে হত্যা ও হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন। রহস্য এতদূর গড়িয়েছে যে আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন সমস্ত ব্যাপারটি তদন্ত করতে শুরু করেছেন। একদা গুরু-শিষ্যার এই দ্বন্দ্ব এবং তার পরবর্তী ঘটনা নিয়ে এই প্রতিবেদন।

গুরু রজনীশের মুক্ত প্রেমের আশ্রমে হত্যার ষড়যন্ত্র

সাধনায় সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে হিমালয় যাত্রার পরিবর্তে প্রচারে সিদ্ধিলাভ যে সব ভারতীয় ধর্মগুরুদের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে, ইদানীং আমেরিকাই তাঁদের সকল তীর্থের সার। মুষ্টিমেয় কিছু সম্প্রদায় ছাড়া এমন কোন সম্প্রদায়ের একজনও গুরুদেব নেই, যিনি আমেরিকার ছাপ না নিয়ে বসে আছেন। পৃথিবীর কোণে কোণে হিন্দু ধর্মের প্রচার কতদূর সফল হতে চলেছে, কত সংখ্যক অন্যধর্মের মানুষ সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন, সেসব প্রশ্নের উত্তর সম্ভাব্যতার পর্যায়ে থাক। আসল কথা, এঁরা আসেন বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এঁদের প্রবাসের জীবনযাত্রা। মার্কিন জগতে কোথাও কোন বড় রকম আলোড়ন সৃষ্টি হয় না, যেমন হয়েছিল প্রভুপাদ তথা ইস্কনকে নিয়ে। ইস্কন এখন আমেরিকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটি শাখা নদীর প্রবাহকে অব্যাহত রাখার চেষ্টায় অনেকাংশেই সফল হয়েছে। মঠ, মন্দির, বিগ্রহ, আশ্রম, সাধনভজন নিয়ে তাঁদের সম্প্রদায়ের পরিচয়টি এদেশে প্রায় সর্বজনবিদিত।

অপর পক্ষে আছেন ভগবান রজনীশ, শ্রী গুরু মহারাজ নামধারী ধর্মগুরু। যাঁরা ঐ চিরাচরিত ধর্মীয় বিধি-বিধানকে নস্যাৎ করে দিয়ে কখনো "নিছক আনন্দ" কখনো "আলোর স্পর্শ" ইত্যাদি অপূর্ব সুখের চাবিকাঠি নিয়ে আমেরিকা চলে আসেন। প্রথম কয়েকদিন বেশ উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। আমেরিকার বিভ্রান্ত কিছু ছেলে মেয়ে, বিয়ে-ভাঙ্গা একদল স্বামী-স্ত্রী–হাতে যাদের অঢেল ডলার, দুঃখ ভুলতে ঐ মায়া আকর্ষণে বাঁধা পড়েন। দেশ থেকে আসে গুরুর কয়েকজন ভারতীয় শিষ্য। হাজার হাজার ডলার জড়ো ক'রে শুরু হয় আশ্রম প্রতিষ্ঠার নামে রাজসিক কান্ডকারখানা। কোন গুরুদেব আমেরিকায় পাকাপাকি থাকার সুবিধের জন্য অচিরে একটি মেমসাহেবের পাণিগ্রহণ করেন। কয়েকদিন কাগজে, টেলিভিশনে খবর প্রচারিত হয়। কিছুদিন চুপচাপ। কালেভদ্রে শোনা যায় তাদের কথা। তারপরই হঠাৎ একেবারে কেচ্ছা - কেলেংকারির চূড়ান্ত। উত্তর প্রদেশীয় বালক গুরু মহারাজের নেপালী ধাঁচের মুখ ভেসে ওঠে টেলিভিশনের পর্দায়। তাঁর মা নাকি তাঁকে মামলায় ফাঁসিয়েছেন। ছেলের মুখোস খুলে দেবার জন্যে মা যশোদার তখন রুদ্রচন্ডী রূপ! আবার ইদানীং শুরু হয়েছে ভগবান রজনীশের আনন্দ আশ্রমে মহা অশান্তি। অবশ্য বৃন্দাবন কুরুক্ষেত্রে পরিণত হবার আগেই পুলিশ হাল ধরেছে।

পুণার আশ্রমের মায়া ত্যাগ করে ভগবান রজনীশ আমেরিকায় এসেছেন ১৯৮১ সালে। সে সময় এই পূর্ব উপকূলে নিউজার্সির মণ্টক্লেয়ার শহরে সাময়িক অজ্ঞাত-বাস শেষ করে সরাসরি পশ্চিম উপকূলে ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরে অরিগন স্টেটে চলে গিয়েছিলেন। সেখানকার অ্যান্ট্‌লোপ শহরে একটি গোপালন অঞ্চল কেনার পর প্রায় ৩000 শিষ্য-শিষ্যাসহ আশ্রম খুলে বসলেন। ইতিমধ্যে আমেরিকান শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা পুণার আশ্রমে গিয়ে রজনীশের মুক্ত প্রেমের ক্ষেত্র দেখে এসেছেন, তাঁরা এখানেও সেই পরিবেশ গড়ে তুলতে চাইলেন। আমেরিকানদের দৌলতে রজনীশের আশ্রম, ৯৩টি রোলস রয়েস গাড়ি, প্রাইভেট এরোপ্লেন, কিছুরই অভাব থাকল না। শিষ্যরা নিজেদের পরিচয় দিলেন 'রজনীশী' নামে। এক সময় শহরের নাম হয়ে গেল রজনীশপুরম। ৬৪,000 একর সম্পত্তির নাম দেওয়া হল Rancho Rajneesh. অর্থাৎ টেকসাসের খামার বাড়ীর কায়দায় রজনীশের র‍্যাঞ্চ। এদের আশ্রমিক জীবনের উদ্দেশ্য হল অবারিত যৌন অভিজ্ঞতার সাহায্যে অপূর্ব আনন্দ লাভ এবং সর্বদা রসে বশে থাকা। রজনীশ বার বার বলেছেন – যেন তেন প্রকারে আনন্দে থাকাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। অরিগনের স্থানীয় বাসিন্দারা এত সহজে রজনীশীদের আধিপত্য স্বীকার করলেন না। তাদের জবর দখল মনোভাব, শরীরধর্মের নগ্ন প্রচার, পোস্টার, টাইম ম্যাগাজিনে "আনন্দের" বিজ্ঞাপন এঁদের মন বিরূপ করে তুলেছিল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেখলেন অপর পক্ষ বন্দুক হাতে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। এঁরা মরীয়া হয়ে সরকারের সাহায্য চাইলেন। কিন্তু আমেরিকার সংবিধান অনুযায়ী সরাসরি কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের ওপর হস্তক্ষেপ করা বেআইনী। তাছাড়া, আমেরিকান শিষ্য শিষ্যারাই তো আশ্রমিক হয়ে বসেছে। আইনের ফাঁক-ফোকরগুলি তারা বিলক্ষণ জানে। ফলে ঘরের শত্রু বিভীষণদের নিয়ে স্থানীয় সমাজ পর্যুদস্ত হলেন। ১৯৮২ সালে রজনীশীরা কাছাকাছি ৩৫ মাইলের মধ্যে সব জমি কিনে নিল। রজনীশীরা সবচেয়ে বড় চাল চাললো ১৯৮৪ সালে। ঐ অঞ্চলের নির্বাচনের আগে হঠাৎ সারা আমেরিকা থেকে ৩,৮00 জন ভবঘুরে দরিদ্র লোকজনকে খুঁজে পেতে সেখানে নিয়ে গেল। নির্বাচনে ভোট দিয়ে এরা সবাই রজনীশীদের দলভারী করে তুলল। শহরের মেয়র পদে নির্বাচিত হল একজন রজনীশী। শহরের নাম তো রজনীশপুরম হয়েই গেছে ইতিমধ্যে। অ্যান্টলোপ নামটিই মুছে গেল। এমন তাদের প্রভাব। স্থানীয় লোকজনরা অনন্যোপায় হয়ে অন্যত্র চলে যেতে শুরু করলেন। আশ্রমিকরা ১২ ঘন্টা কাজকর্ম করে। সপ্তাহ শেষে দশ ডলার মাইনে, থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা আর রাতের ডিস্‌কো নাচ ও দেহজ প্রেমের আনন্দ সন্ধানে মশগুল হয়ে থাকল। শিষ্য শিষ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫000 হয়েছে সম্প্রতি।

কিন্তু এই সব পরিকল্পনায় যিনি ছিলেন নাটের গুরু, সেই রজনীশের প্রধান পরামর্শদাত্রী মা আনন্দ শীলা, তিনিই নাকি এখন রজনীশের সঙ্গে চরম শত্রুতা শুরু করেছেন। মা আনন্দ শীলা নামের ৩৫ বছর বয়স্কা

এই মহিলার সাহায্যে রজনীশ আমেরিকায় এসেছিলেন। অ্যান্টলোপের খামারবাড়িও কেনা হয় তাঁর ব্যবস্থাপনায়। গত সাড়ে তিনবছর রজনীশ মৌনতা অবলম্বন করে ছিলেন। মা আনন্দ শীলা ছিলেন তাঁর মুখপাত্র এবং সারা আশ্রমের সংগে গুরুর যোগসূত্র বজায় থাকতো তাঁর মাধ্যমে। শুধু আমেরিকায় নয়, সারা পৃথিবীর অন্যান্য রজনীশ আশ্রমেও মা আনন্দ শীলা নির্দেশ পাঠাতেন। কিন্তু ১৯৮৪-র অক্টোবর মাস থেকে রজনীশ তাঁর নীরবতা ভংগ করে বেশ সোচ্চার হয়ে ওঠায় সম্ভবত গুরু শিষ্যার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। শেষপর্যন্ত গত ১৪ই সেপ্টেম্বর শিষ্যা তাঁর পদে ইস্তফা দিয়ে ২০জন অনুগামীসহ আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেছেন। পশ্চিম জার্মানি হয়ে আপাততঃ আছেন লন্ডনে। পশ্চিম জার্মানীর পত্রিকা Stern-এ তিনি কিছু বক্তব্য ও রেখেছেন। রজনীশ পুরমে "রজনীশ টাইমস্" নামে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেখানে নাকি চলে যাবার আগে তিনি লিখে গেছেন – 'এত দলাদলি, মতবিভেদের মধ্যে আমি কাজ করতে অক্ষম। এ কারণে পদত্যাগ করলাম।'

এদিকে রজনীশ বলেছেন সম্পূর্ণ অন্যকথা। তিনি দলছুট শিষ্য শিষ্যাদের বিরুদ্ধে সরাসরি হত্যা, হত্যার চেষ্টা এবং চুরি ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন স্থানীয় পুলিসের কাছে। সাংবাদিকদের শুনিয়েছেন নানা ষড়যন্ত্রের কাহিনী। বলেছেন ওরা আশ্রমে ফ্যাসিবাদ আনতে চেয়েছিল। আমার মুক্ত প্রেমের আশ্রমে তারা মানুষ খুন করেছে। কয়েকজনকে বিষ দিয়ে মারতে চেষ্টা করেছে। গত বছর দুটি সরকারি দফ্তরে আগুন লাগানোর জন্যে ওরাই দায়ী। আর অর্থের এমন অপব্যবহার করেছে যে আশ্রম আজ ৫০ মিলিয়ন ডলারের দেনায় জড়িয়ে গেছে। রজনীশের বক্তব্য – তিনি কিছুকাল ধরেই রজনীশপুরমে অরাজকতার আভাস পাচ্ছিলেন। সে কারণে আর তাঁর পক্ষে নীরবতা রক্ষা করা সম্ভব হ'ল না। মা আনন্দ শীলা গুরুর নীরবতার সুযোগে নিজের ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করেছেন। শেষপর্যন্ত রজনীশ অভিযোগ করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক ও পরিচারিকাকে ঐ মহিলা ও তাঁর দলের লোকজন বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করেছেন। চিকিৎসক স্বামী দেবরাজের অভিযোগ অন্তত পক্ষে তিন/চার বার তাঁর খাবারে বিষ মেশানো হয়েছে তিনি বুঝতে পেরে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। রজনীশ আরও বলেছেন – ঐ কয়েক হাজার ভবঘুরে, দরিদ্র লোকগুলি ভোটের জন্যে ধরে আনার পর, যখন কার্যসিদ্ধি হয়ে গেল, তখন তাদের নিষ্ক্রিয় রাখার জন্য নিয়মিত একরকম ওষুধ খাইয়ে দিত তারা। ওষুধের অপপ্রয়োগের ফলে ২৮ বছরের এক হতভাগ্য মারা গিয়েছিলেন। পরে শবব্যবচ্ছেদ হওয়াতে তার রক্তে এমন এক ধরনের ওষুধ পাওয়া গেছে যা মানুষকে ঝিমিয়ে রাখে। এই ওষুধের প্রেসক্রিপশন রজনীশ-পুরমেরই এক ফার্মাসিস্ট লিখে দিত। মা আনন্দ শীলার দল ভয় দেখিয়ে, জোর করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিকে দখল করতেন। একটি বড় শহর ডালেস্-এর পানীয় জলের সরবরাহে বিষ মিশিয়ে অধিবাসীদের অসুস্থ করা এ সবের পেছনে তাঁদের অদৃশ্য হস্তক্ষেপ। রজনীশের অভিযোগ গুলিকে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন(F.B.I) তদন্তের পক্ষে যথেষ্ট বলেই মনে করছে। হত্যা, হত্যার ষড়যন্ত্র, জাল, জুয়াচুরি, অর্থ আত্মসাৎ, গুরুর ঘরে ওয়্যার ট্যাপিং এর সাহায্যে লুকিয়ে খবর সংগ্রহের চেষ্টা–মা আনন্দশীলার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনেছেন রজনীশ।

দীর্ঘদিন ধরেই মার্কিন সরকার রজনীশী দল আর স্থানীয় বাসিন্দাদের বিবাদ বিসংবাদ নিয়ে কিছু হস্তক্ষেপ করতে চাইছিল। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে সেখানকার ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রতিনিধি জিম উইভার বিষয়টি নিয়ে বেশীদূর এগোতে পারেননি। এবার রজনীশ নিজেই সব খোলাখুলি বলতে শুরু করায় ঘটনা পৌঁছে গেছে F.B.I পর্যন্ত। অরিগন রাজ্য পুলিস ইতিমধ্যে আশ্রমে অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছে। সেখানে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পুলিস প্রহরার ব্যবস্থা হয়েছে।

শেষবার রজনীশের সংগে মা আনন্দ শীলার সংঘর্ষ হয় একটি বিশেষ কারণে। Aids বা "অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনো ডেফিশিয়েন্সি সিনড্রোম" নামক দুরারোগ্য এবং সংক্রামক রোগটি এখন আমেরিকার আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্তবাহিত এই রোগের প্রধান শিকার সমকামী এবং উভয়কামী পুরুষ। এবং ক্ষেত্র-বিশেষে তাদের সংস্পর্শে আসা মহিলারাও। এদের জন্যে মা আনন্দ শীলা নাকি রজনীশপুরমে আশ্রমে ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। রজনীশ মত দেননি। আক্রান্ত রোগীরা আসলে আশ্রমেরই বাসিন্দা কিনা, সেখানে সমকামিতা অথবা উভয়কামিতার প্রশ্রয় আছে কিনা, সেসব খবর সঠিক প্রকাশ পাচ্ছে না। তবে সম্প্রতি রজনীশ AIDS এর জন্যে শিষ্য শিষ্যাদের ভীষণভাবে সাবধান হতে উপদেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন – যৌন সংসর্গের সময় প্রত্যেকে যেন অবশ্যই জন্মনিয়ন্ত্রক ব্যবহার করে। কারণ AIDS এর সংক্রমণ বন্ধ করার জন্যে এই সাবধানতা একান্ত প্রয়োজনীয়। দেখা যাচ্ছে, এতো ডামাডোলের মধ্যেও তিনি মুক্ত প্রেমের প্রচারের কথা ভোলেননি। মা আনন্দ শীলা পদত্যাগ করার পর রজনীশের সংগে আরও কয়েকজনের মত-বিরোধ হয়েছে। কারণ রজনীশ নিজের ব্যবহারের জন্য একখানা রোলস্ রয়েস গাড়ি রেখে দিয়ে বাকি ৯২টি রোলস রয়েস্ ৫০০০ হাজার শিষ্য শিষ্যার ব্যবহারের-জন্যে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। গাড়ীর মালিকানা রজনীশের নয়, সেগুলির মালিক 'রজনীশ ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট'। তার প্রেসিডেন্ট স্বামী দয়ান প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন – এ প্রস্তাব গৃহীত হবেনা।

এদিকে মা আনন্দ শীলা চলে গেলেও তাঁর স্থান শূন্য থাকেনি। সেখানে এখন জাঁকিয়ে বসে গেছেন মা প্রেমহাস্য। তাঁর আসল নাম ফ্রাঁসোয়া রুডি। 'গডফাদার' ছবির প্রযোজক অ্যাল্‌রুডির ভূতপূর্ব স্ত্রী ফ্রাঁসোয়া বর্তমানে রজনীশপুরমের এক চিকিৎসকের জীবনসঙ্গিনী। সম্প্রতি প্রেমহাস্য রজনীশের প্রধান মুখপাত্র হয়ে সাংবাদিকদের সংগে কথাবার্তা বলেছেন। শোনা যাচ্ছে, মা আনন্দ শীলা ও তাঁর দলবল পৃথিবীর কোন রজনীশ আশ্রমে ঢুকতে পারবে না।

কিন্তু তাঁর নামে যত অভিযোগই জমা হক, আশ্রমের বাইরের লোকেরা অনেকেই সেসব বিশ্বাস করছেন না। তাঁদের ধারণা– রজনীশ যেহেতু আমেরিকায় থাকার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতে বেশ বিপদে পড়েছেন, সে হেতু এক নতুন পন্থা আবিষ্কার করেছেন। মা আনন্দ শীলাকে কেন্দ্র করে কিছু মামলা শুরু করলে State Dept.-এর সব মনোযোগ সাময়িক ভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মামলা শুরু হলে নিজের মার্কিন বাসের মেয়াদও আইনসংগত কারণ দেখিয়ে বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। অথবা অরিগনের স্থানীয় মার্কিন বাসিন্দাদের সন্তুষ্ট করার জন্য মা আনন্দ শীলাকে সরিয়ে দিয়ে দেখাচ্ছেন তিনি অন্যায়ের প্রতিকার করছেন, আশ্রমের পরিবেশ উন্নত করছেন।

গুরু শিষ্যার দ্বন্দ্ব যদিও বা কোনোদিন মিটে যেত, F.B.I রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করছে, মানে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। মা আনন্দ শীলাকে নিরানন্দ করার জন্যে সদানন্দ রজনীশ বেশ উঠে পড়ে লেগেছেন বোঝা যাচ্ছে। □



মা আনন্দশীলা

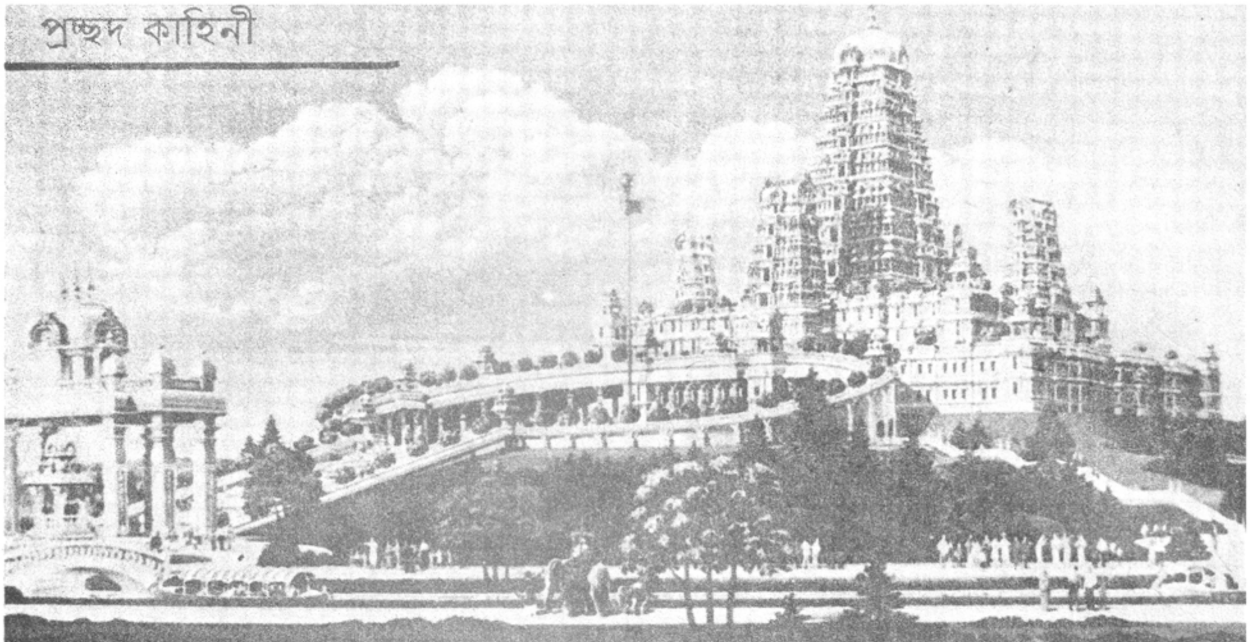


বর্তমান প্রধানা শিষ্যা মা প্রেমহাস্য

নিউজার্সি থেকে
আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

ফটো : লেখিকা সংগৃহীত

প্রচ্ছদ কাহিনী



বিশ্বের সর্বোচ্চ কৃষ্ণমন্দিরের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হলে যা হবে

আমেরিকার হিন্দু মন্দির ঐশ্বর্যে তাজমহলকে ছাড়িয়ে যাবে

পশ্চিম জগতের রাজধানী আমেরিকা – যেখানে পৃথিবীর সব থেকে উঁচু বাড়ি 'সিয়ার্স টাওয়ার', সব থেকে উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট 'লেক পয়েন্ট টাওয়ার' এবং সব থেকে উঁচু হোটেল 'পিচট্রি প্লাজা' আছে – সেখানে আর একটি নতুন ধরনের কীর্তি তৈরি হতে চলেছে – পৃথিবীর সর্বোচ্চ হিন্দু মন্দির। 'দ্য রাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র টেম্পল অব আন্ডারস্ট্যাডিং'-এর উচ্চতা হচ্ছে ২১৬ ফুট – প্রায় ২৩ তলা বাড়ির সমান। স্থান – মন্ডসভিল, পশ্চিম ভার্জিনিয়া। এর উদ্যোক্তা 'ইস্কন' বা ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ কৃষ্ণ কন্সাসনেস – যাদের সদস্য সংখ্যা আজ সারা পৃথিবীতে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি।

আজ মাস ছয়েক হল প্রতিমাসেই দু তিনবার করে আমার বাসস্থান (ও কর্মস্থান) ডেন্ভার, কলোরাডো থেকে এখানে যাতায়াত করতে হচ্ছে। দূরত্ব কম নয় – আসতে যেতে প্রায় তিনহাজার মাইল। ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদের বিশিষ্ট আমেরিকান শিষ্য শ্রীকীর্তনানন্দ ভক্তিপাদের বিশেষ আমন্ত্রণে এসেছি এই ঐতিহাসিক কৃষ্ণ মন্দিরের আলোর ডিজ্যাইন করার জন্য। মন্দিরের প্রাথমিক কাজগুলো শুরু হলেও নক্সা এখনও শেষ হয়নি। দেশ বিদেশ থেকে খ্যাতনামা আর্কিটেক্ট ও এঞ্জিনিয়ারদের আনা হয়েছে নক্সা তৈরির জন্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়া রাজ্যের মন্ডসভিল-এ প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ইস্কন' তৈরী করছে 'নব বৃন্দাবন'। ইস্কনের স্বপ্নপুরী হবে 'তাজমহল অব দ্য ওয়েস্ট'। ভারতসহ নানা দেশের স্থপতি ও এঞ্জিনিয়ারদের মাঝে মাঝেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওখানে। ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামীর স্বপ্ন সার্থক করে তুলছেন তাঁরই শিষ্যরা চার হাজার একর জমির উপর। ১০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ কৃষ্ণমন্দির ঘিরে গড়ে উঠবে একটি নতুন শহর – যেখানে থাকবে নতুন তীর্থক্ষেত্র নব বৃন্দাবনের বাসিন্দাদের ধর্মাচরণ ও বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু।

এই মন্দির-শহরের লাইটিং ডিজাইনের দায়িত্ব পেয়েছেন আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার মানিক সরকার। তিনিই প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছেন।

শুধু উচ্চতার পরিমাপ দিয়ে মন্দিরটির বিশেষত্বের পরিচয় দিলে হয়ত ভুল হবে। এটা শুধু সব চাইতে উঁচুই নয় – সর্ব বিশালও বটে। বাইরেটা আড়াই ফুট মোটা গ্রানাইট পাথরে এবং ভেতরটা পুরো শ্বেতপাথরের তৈরি এই মন্দিরটিকে এমনভাবে গড়া হচ্ছে যাতে এটা একহাজারেরও বেশি বছর টেকে এবং প্রতিদিন আনুমানিক দশহাজার পর্যটক অনায়াসে মন্দিরের দেবদেবীর দর্শন করতে পারেন। শুধু বাইরেটা করতেই লাগছে ২৭,০০০ টন গ্রানাইট – আনা হচ্ছে ভারতবর্ষ, ফ্রান্স ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। কাটা ও গ্রুভিং স্যান্ড ব্লাস্টিং ও লেসার বিম-এর সাহায্যে। পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে এক হাজারের মত লোক কাজ করবে আগামী দশ বছর ধরে – ইস্কনের এই স্বপ্নপুরী হবে 'তাজমহল অব দ্য ওয়েস্ট'।

মন্দিরটা তৈরি হচ্ছে পশ্চিম ভার্জিনিয়া রাজ্যের উত্তর-পূর্ব কোণায় মন্ডসভিল শহরে – পেনসিলভানিয়া রাজ্যের বিখ্যাত পিটসবার্গ শহরের কাছাকাছি। প্রায় চারহাজার একর জমি নিয়ে তৈরি হচ্ছে একটি হিন্দু তীর্থক্ষেত্র; নাম – 'নিউ বৃন্দাবন' (নব বৃন্দাবন)। এই মন্দির শুধু আমেরিকারই নয়, সারা পৃথিবীরই বড় আকর্ষণ হবে। বিশালতায় এবং শিল্পকলায় এর অবদান ভারতবর্ষের শ্রীরঙ্গম, তিরুপতি বা খাজুরাহ

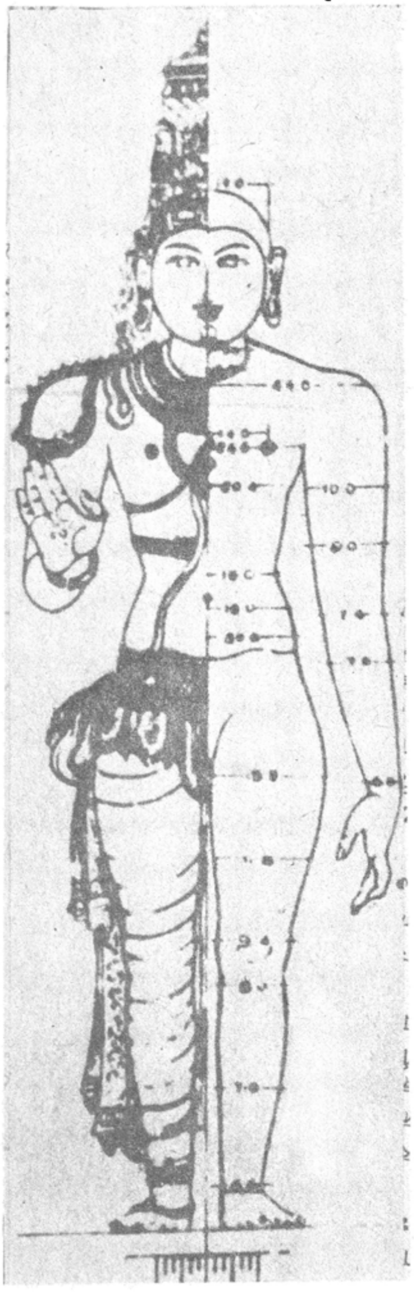
তো বটেই — খৃস্টসমাজের বিখ্যাত ক্যন্টারবারি (ইংল্যান্ড) বা চারট্রেস (ফ্রান্স), এর সঙ্গেও তুলনীয়। একাদশ শতাব্দীতে তৈরি তাঞ্জোরের বিশাল শিবমন্দিরের থেকেও এটি উঁচু। শুধু মন্দিরের জন্যই এদের বাজেট হচ্ছে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় দুশো কোটি টাকা। নব বৃন্দাবনে এ বাদেও থাকবে বিশাল গোশালা, বয়স্কদের জন্য রিটায়ার সেন্টার, ভক্তবৃন্দের বাসস্থান, স্কুল, হাসপাতাল এবং ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীলা প্রভুপাদের স্বর্ণমন্দির।

মন্ডসভিল-এর মত ছোট, একটা প্রায় অজানা শহরে (জনসংখ্যা মাত্র ছয়হাজার) মন্দিরটি তৈরি করার একটা বিশেষ কারণ আছে। শ্রীকৃষ্ণের আদি বৃন্দাবনের মত এটিও গাছপালাতে ভরা, নিরিবিলি গ্রাম্য পরিবেশ — অথচ জনসমুদ্র থেকে খুব একটা দূরেও নয়! মাত্র ৬৫ মাইল দূরে পিটসবার্গ শহর (জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ) এবং মাত্র ৫০০ মাইল গন্ডির মধ্যেই রয়েছে পুরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষ। অর্থাৎ মাত্র একদিনের গাড়ি চালিয়ে আসবার দূরত্বের মধ্যেই রয়েছে প্রায় ২৭৫ মিলিয়ন উৎসুক জনসাধারণ।

নব বৃন্দাবনের যে অংশটুকুতে (১০০ একর) কৃষ্ণমন্দির বা তার সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি তৈরি হচ্ছে, তার নাম হবে 'ল্যান্ড অব কৃষ্ণ'। পুরোটা শেষ হয়ে গেলে, ভালভাবে দেখতে একজন লোকের তিনদিনের মত লাগবে। প্রথম দিনে দেখবেন প্রভুপাদের স্বর্ণমন্দির এবং তার সংলগ্ন বাগানকে ('গার্ডেন অব প্যালেস')। প্রভুপাদের মন্দির ইতিমধ্যে তৈরি হ'য়ে গেছে — বাগানটা তৈরি হচ্ছে। স্বর্ণমন্দিরের পুরো পাশ জুড়ে প্রায় ১৫০০ ফুট লম্বা এই বাগানে থাকবে দেশ বিদেশ থেকে আনা ফল, ফুল, গাছপালা এবং পাশে একটি বিশাল মুক্তাঙ্গন। ভারতীয় নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদির কৃতি কলাক্ষেত্র হবে এটি। এর পাশে থাকবে রেডিও এবং টি ভি স্টুডিও ও প্রচারকেন্দ্র। এর উদ্দেশ্য বহিরাগতদের নতুন পরিবেশের সঙ্গে এবং শ্রীকৃষ্ণর শিক্ষাগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। একটু দূরেই দুটি সরোবরে থাকবে সনাতনগতিক ভারতীয় প্রথায় সিঁড়ি দেওয়া ঘাট। সরোবরের মাঝে থাকবে একাধিক রাজহংস নৌকো এবং বোট হাউস। অদূরে দেখা যাবে গৌর, নিতাই মহাপ্রভুদের বিশাল মূর্তি।

দ্বিতীয় দিনের আকর্ষণ হবে ২৭ একর জমি জুড়ে কৃষ্ণলীলা ক্ষেত্র। এই পার্কের মধ্যে থাকবে ভারতীয় গ্রামের সহজ সরল জীবন যাপনের দৃশ্যের পরিবেশে পূর্ণাকার গরু বাছুরের সঙ্গে রাখাল-কৃষ্ণের ৪০০ নানা রকমের মূর্তি! উদ্দেশ্য — পর্যটকদের শ্রীকৃষ্ণের জীবনধারার সঙ্গে মিউজিয়মে ঘোরার মত পরিবেশে চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। মজার কথা হচ্ছে, পুরো কৃষ্ণলীলা ক্ষেত্রকে শুধু হেঁটে বা গাড়িতে বসেই নয়, হাতির ওপরে কিংবা গরুর গাড়িতে চড়েও দেখা যাবে।

তৃতীয় দিনের আকর্ষণ — অদূরে পাহাড়ের ওপর বসান গ্রানাইট ও শ্বেতপাথরে তৈরি, ছবির মত সুন্দর, বিশাল রাধা কৃষ্ণের মন্দির। পাহাড়ের পাদদেশে গোল করে সরোবর ও রাস্তা। বাইরে থেকে সরোবরের ওপরে ব্রিজ দিয়ে এসেই পাওয়া যাবে অষ্টস্তম্ভযুক্ত প্রায়


নব বৃন্দাবনে প্ল্যানিং বিভাগের লোগো — কৃষ্ণ

চল্লিশফুট উঁচু প্রধান প্রবেশ দ্বার। প্রবেশ দ্বার পেরিয়ে গেলেই সামনে প্রায় ৩০০ ফুট লম্বা সিঁড়ি, যা ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে উঠে গেছে। ওপরে উঠে মন্দিরে যেতে দুটো পথ খোলা। একটা হচ্ছে সোজা চলে যাওয়া মন্দিরের গ্রাউন্ড ফ্লোরের দিকে, অন্যটা হচ্ছে র‍্যাম্প করে হেঁটে মন্দিরের প্রধানতলা — টেম্পল প্লাজার দিকে।

প্রায় তিরিশ ফুট চওড়া দুটো র‍্যাম্প সিঁড়ির ওপর থেকে দুপাশ দিয়ে গোল হয়ে চলে গেছে প্রায় চল্লিশফুট ওপরে, মন্দিরের এই প্রধানতলার প্রবেশ দ্বারের দিকে। র‍্যাম্প-এর ঢালটা এমনভাবে ডিজাইন করা হবে যাতে একজন বৃদ্ধলোকেরও ওপরে উঠতে অসুবিধা না হয়। র‍্যাম্প-এর তলায় থাকবে ১২টি মহাজন মূর্তি 'প্রহরী' — ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বালী, শুকদেব, কপিল, নারদ, মনু যমরাজ, জনক, শিব এবং ব্রহ্মা — প্রতিটি মূর্তিই দাঁড়ান অবস্থায় এবং ৩০ ফুটের মত উঁচু। প্রায় ৩০০ ফুট ব্যাসের এই দুটির মাঝখানে থাকবে বিরাট ফোয়ারা এবং চারদিকে বসার এবং হাঁটবার জায়গা। ফোয়ারার মাঝে থাকবে 'জ্যোতি স্তম্ভ' (প্রায় ১১০ ফুট উঁচু), মাথায় জ্বলবে অনির্বাণ শিখা। র‍্যাম্প দুটির বাইরের পাশ দিয়ে থাকবে ফল ও ফুলের গাছ। র‍্যাম্প দিয়ে না গিয়ে, সোজা গেলে পৌঁছবে মন্দিরের নিচতলায়। ঢুকতেই দেখা যাবে ছটি বিরাট হস্তী স্তম্ভ। ভেতরে ঢুকলেই বিরাট হল। ওখানে থাকবে অনুসন্ধান কেন্দ্র, বসবার ও বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। হল ঘরের দেওয়ালে দেবদেবীর মূর্তি ও ছবি। এই তলাটি প্রধানত মন্দিরের আভ্যন্তরিক কাজকর্মের জন্য। বাকি জায়গাটাতে থাকছে ভোগ তৈরি করার জন্য বিশাল রান্নাঘর (প্রায় ৮০০০ বর্গফুট), ভোগ ও প্রসাদ ওপরের তলাগুলোতে তোলার জন্য এলিভেটর ঘর, ভাঁড়ার ঘর, প্রায় ৪৮০ জন ভক্তের থাকবার ঘর, মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুড়িটা অফিস ঘর, ভক্তদের খাওয়ার ঘর, ছোট চিকিৎসালয়, বিদ্যুৎ বিতরণের প্রধান কেন্দ্র জেনারেটর রুম, হিট-ভেন্ট এয়ারকন্ডিশনের প্রধান ঘর, অগ্নিনির্বাপক ঘর ইত্যাদি। এই তলার নিচে এবং মন্দিরের পেছনের দিকে থাকবে দুটো তলা। যাতে মন্দিরে বসবাসকারী ভক্তবৃন্দের গাড়ি রাখার জায়গা থাকবে। একেবারের নিচের তলায় থাকবে খাদ্যদ্রব্যাদি আনয়নকারী এবং জঞ্জাল সরানর ট্রাকগুলির যাতায়াতের পথ। এগুলি শুধু মন্দিরের পেছন দিক দিয়েই ঢুকতে বা বের হতে পারবে। ওপরের তলাগুলোতে যাওয়ার জন্য থাকবে চারটে এলিভেটর ও চারজোড়া সিঁড়ি। নিচের তলার ঠিক ওপরের তলায়

থাকবে ৩৭৬ জন ভক্তের থাকার ঘর, মন্দিরের হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত লাইব্রেরি, ভারতীয় নাচ, গান ও নাটকের জন্য থিয়েটার, ভিডিও রেকর্ডিং এবং প্রজেকশনের ঘর ইত্যাদি।

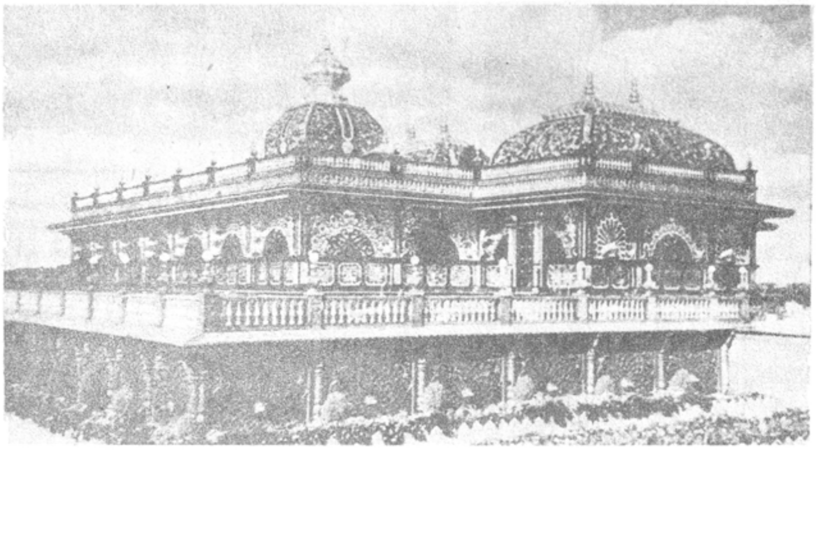
এর ওপরের তলাটিই হচ্ছে টেম্পল প্লাজা, যেটা মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ। এই তলাতে আসতে গেলে অনেক উপায় আছে। প্রথমটি র‍্যাম্প ধরে হেঁটে আসা – যা খুবই মনোরম এবং দৃশ্যকর। দ্বিতীয়টি নিচের তলাগুলি থেকে এলিভেটর বা সিঁড়ি দিয়ে আসা। আর তৃতীয়টি মনো রেলে চড়ে আসা। নব বৃন্দাবনে পৌঁছে একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে মনো রেলে সোজা মন্দিরে চলে আসা যাবে। এই তলার কিছু অংশ মুক্তাকাশের তলায় – বাকিটা মন্দিরের স্তম্ভের (বিমানম্ বা টাওয়ার) মধ্যে। মুক্তাকাশের নিচের অংশটুকু খুব সুন্দর করে সাজান – এটাই হবে 'বৈকুন্ঠ'। র‍্যাম্প দিয়ে উঠে এলে, এই তলার প্রবেশপথেই থাকবে উড়িষ্যার স্টাইলে কারুকার্য করা দুটো পাথরের বিশাল রাজছত্র। ছত্র অতিক্রম করলেই দেখা যাবে বৈকুন্ঠের দ্বার প্রহরীদ্বয় 'জয়' এবং 'বিজয়ের' বিশাল মূর্তি। বৈকুন্ঠের চারপাশে থাকবে ফল ও ফুলের গাছ, জলাশয়, 'পদ্মফুল – ফোয়ারা' (লোটাস ফাউন্টেন)। জলাশয়ের আশপাশ দিয়ে থাকবে পরিক্রমা করার রাস্তা এবং বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা।

বৈকুন্ঠ পেরিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেই সামনে চোখে পড়বে মোজেক দিয়ে গড়া দুটো বিশাল মুরাল – একটি বরাহের অন্যটি নরসিংহের – হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করার চেহারায়। লবির ভেতর দিয়ে আর একটু এগোলেই দেখা যাবে ওপর থেকে 'স্টেন্ড গ্লাসের' মধ্য দিয়ে আসা সূর্যরশ্মির সঙ্গে মিশ্রিত কৃত্রিম আলোর সংযোগ – যা আলোকিত করবে ঘরের মাঝে একটি বড় থামের চারপাশে গোল করে থাকা ১৬টি কালো রঙের 'সংগীত স্তম্ভ' (singing columns)। মজার কথা, শুধু হাতে বা কাঠের টুকরো দিয়ে এই থামগুলোকে আওয়াজ করলে ৩২টি আলাদা আওয়াজ পাওয়া যাবে। সামনেই সোনার কারুকার্য করা বিশাল দরজা। দরজা খুললেই মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ – কীর্তন ও ঠাকুর ঘর – প্রায় দুশো পঞ্চাশ ফুট লম্বা, একশো পঁচিশ ফুট চওড়া এবং প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু ছাদ। পুরোটাই হাল্কা গোলাপি রঙের মার্বেল দিয়ে তৈরি। মেঝে কারুকার্য করা হবে নানা রকমের পাথর দ্বারা, ঘরের দুপাশ দিয়ে ছাদটাকে ধরে রাখবে নিপুণ হাতের কারুকার্যে ভরা বারোটি বিশাল স্তম্ভ – যার পেছন দিকেও থাকবে দর্শকদের বসার ও দাঁড়াবার জায়গা। ঘরের ঠিক মাঝখানে, ছাদটা ষাটফুট ব্যাসের পরিধিতে এক বিশাল 'ডোম' উপরের দিকে উঠে গেছে মেঝে থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি ফুট – এরই মাঝে থাকবে বিষ্ণুর সহস্র নাম খোদাই করা ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি সুন্দর আলোর ঝালর। এই কীর্তন ঘরের একপাশে থাকবে দেবদেবীর জন্য পাশাপাশি তিনটি দেবঘর। কালো মার্বেল পাথরের ওপর স্বর্ণপত্র দিয়ে কাজ করা – বাঁ দিকের ঘরে থাকবে ভেংকটশ্বরের মূর্তি এবং ডানদিকের ঘরে নৃসিংহদেবের মূর্তি। এদুটি ঘর থেকে বেশি উঁচু – মাঝের শ্বেতপাথরের দেবঘরটিতে থাকবে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। রাধাকৃষ্ণের একপাশে থাকবে গৌর, নিতাই এবং অন্যপাশে শ্রীগোপালনাথ। কীর্তন ঘরের সব জায়গা থেকে এবং তিনপাশ দিয়ে ঘেরা ঘরের বারান্দা থেকে দেবদেবীর মূর্তি ও কীর্তন ঘরের সবরকম অনুষ্ঠানই স্পষ্ট দেখা যাবে।

কীর্তন ও ঠাকুর ঘরের ওপরের তলাটারও কিছু অংশ মুক্তাকাশের তলায় এবং বাকিটা মন্দিরের স্তম্ভের মধ্যে। এই তলার নাম টেম্পল গার্ডেন টেরাস ফ্লোর – বৈকুন্ঠেরই এক্সটেনশান। নিচের তলার মত এটাও ফুল, ফল, গাছগাছালি এবং ফোয়ারা ইত্যাদিতে ভরা। এর ওপর থেকে মন্দিরের বাকি অংশটুকু স্তম্ভের পরিমাপ অনুযায়ী আস্তে আস্তে সরু হয়ে গেছে। কীর্তন ঘরের ওপরকার এই বাকি অংশটুকুতে আরও ছটি তলা – সবগুলোই প্রধানত মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূজাপার্বণের কাজের জন্য।

মন্দির তৈরির জন্য বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞরা

কাশ্যপমুনি শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ভক্ত শিব ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মর্ত্যের বাড়ি ঘর এবং অন্যান্য জিনিসগুলি কী-ভাবে এবং কোন নীতিতে তৈরি করা হবে। শিব ঠাকুর কোন কথা না বলে তৃতীয় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে কাশ্যপমুনির সব প্রশ্নের মনের মত জবাব দেন। এরই নাম শিল্প শাস্ত্র। কৃষ্ণমন্দিরকে শিল্প শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ডিজাইন করতে দেশ থেকে আনা হয়েছে তামিলনাড়ুর বিখ্যাত আর্কিটেক্ট শ্রীমূর্তিয়া স্হপতিকে। শ্রীমূর্তিয়া স্হপতি শুধু মন্দিরই ডিজাইন করেন। শাস্ত্র অনুযায়ী মন্দির ডিজাইন করাই তাঁর বংশানুক্রম জীবিকা। কিন্তু প্রাচীন শিল্প শাস্ত্রের প্রথা অনুযায়ী তৈরি হলেও বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সমস্যা বা অসুবিধাগুলিকে তো এড়ানো যাবে না। এ বাদে আছে আমেরিকার বাড়ি ঘর তৈরি করার নিজস্ব রীতিনীতি। মন্দির হক বা অফিস বাড়ি হক – সব বাড়িই তৈরি হতে হবে ইউনিফর্ম বিল্ডিং কোড, ন্যাশনাল ইলেকট্রিকাল কোড, লাইফ সেফটি কোড ইত্যাদি প্রথার নিয়মানুযায়ী। মন্দিরটি ৭৫ ফুটের বেশি উঁচু – শুধু এই কারণেই এটি নিয়মানুযায়ী বহুতল বাড়ির কোড সেকশনে পড়ে। অর্থাৎ আমেরিকার বড় বড় শহরের বহুতল বাড়িগুলোতে যেসব নিরাপত্তা রীতিনীতি রাখা হয়, তার প্রায় সবই এই মন্দিরের জন্য প্রযোজ্য হবে। সমস্ত বাড়িটি গ্রানাইট এবং শ্বেতপাথরে তৈরি হলেও এতে অনেক জিনিস থাকবে যা দাহ্য পদার্থে তৈরি। এসব বাদেও আছে পুজো এবং আরতি করার জন্য আগুনের অনবরত ব্যবহার – সুতরাং আগুন ধরার আশংকাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তারপর আলো ছাড়াও, রান্না করার উনুনগুলি, বাসনপত্র ধোওয়ার যন্ত্র, ভোগ ও প্রসাদ রান্নাঘর থেকে ওপরের তলায় নির্দিষ্ট ঘরে বিতরণের জন্য তোলার যন্ত্র, এলিভেটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ এবং গরম করার যন্ত্র, প্রতিদিনের জঞ্জালগুলিকে একত্র করে ঠেসে ছোট পুঁটলি করার যন্ত্র – ইত্যাদির জন্য বিরামহীন বিদ্যুৎ লাগবে সর্বক্ষণ। মন্দিরে হাজার হাজার নারী, পুরুষ আসবেন প্রতিদিন – হঠাৎ বিদ্যুৎ বন্ধ হলে কী হবে?



শ্রীপ্রভুপাদের স্বর্ণমন্দির

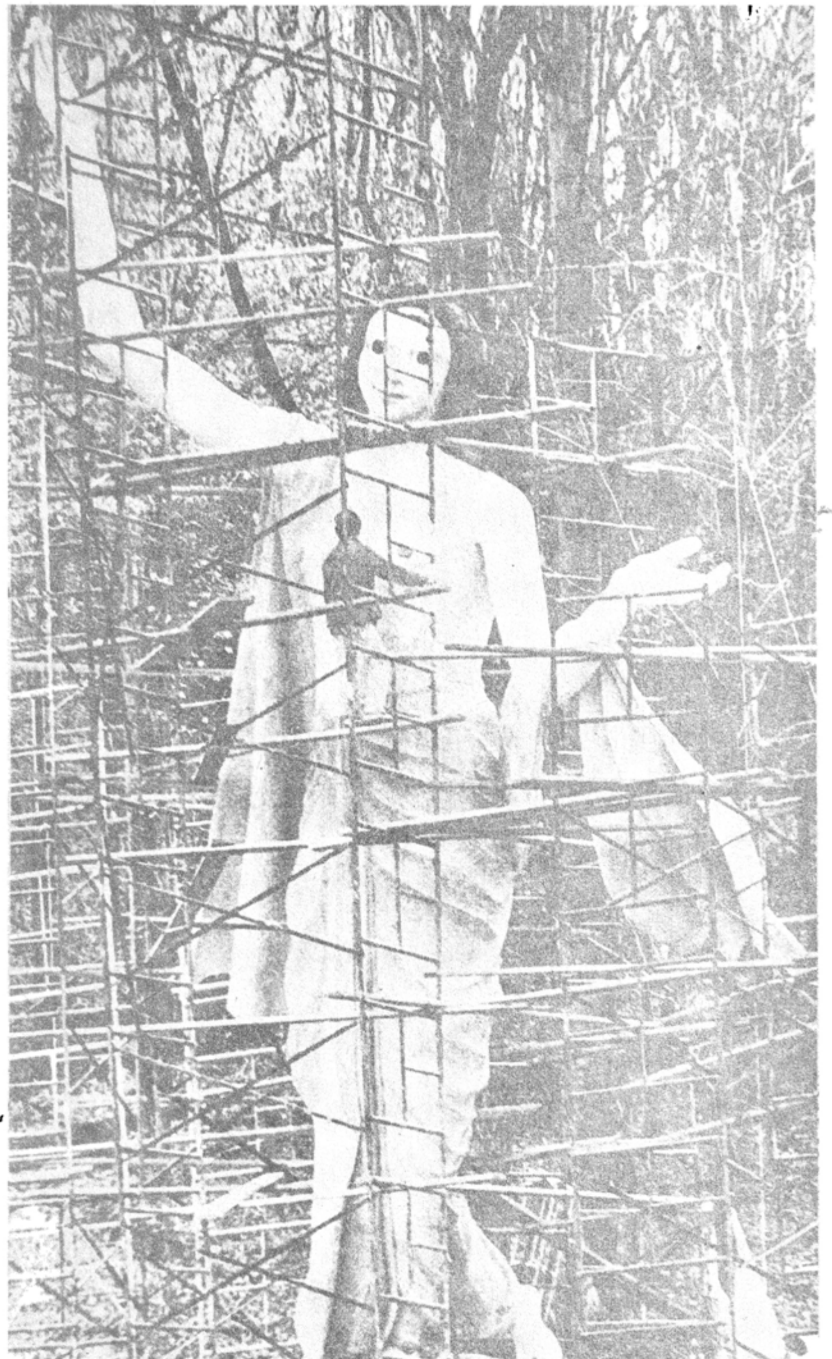
বিভ্রাট মোকাবিলা কী করা হচ্ছে ?

এই ধরনের বিভ্রাটকে মোকাবিলা করার জন্য অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যেমন, বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে সদাপ্রস্তুত জেনারেটর ঐ কাজ করবে। বিদ্যুৎ সংস্থার বিদ্যুৎ কোন কারণে বন্ধ হলেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জেনারেটর নিজেথেকে চলতে শুরু করবে। আগুনের সংগে মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত বাড়ির প্রতিটি তলার প্রতিটি ঘরে থাকবে প্রায় লুকোন অবস্থায় স্মোক ডিটেক্টর এবং জলের পাইপের মুখোমুখি যদি কোন কারণে অস্বাভাবিক পরিমাণে ধোঁয়া হয়, ধোঁয়া-অনুসন্ধান যন্ত্রগুলি তার সাড়া পেয়েই জোরে শব্দ করে আগুন ধরার কথা জানিয়ে দেবে সেই তলায় – যাতে লোকজন তাড়াতাড়ি নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারে। আওয়াজ করা বাদেও সার্কিটের মাধ্যমে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগুলি শহরের দমকলকে জানিয়ে দেবে বিপদের কথা, নিচের তলায় অগ্নিনির্বাপক ঘরে দেখিয়ে দেবে একটা ম্যাপের ওপর আলো দিয়ে বাড়ির কোন জায়গাতে আগুনটা লেগেছে – এবং জলের পাইপের মুখগুলোকে চালু করে দেবে আগুন ধরার অংশটুকুর ওপর অনবরত শাওয়ার-এর মত জল পড়তে।

এসব বাদেও থাকবে কীর্তনের মিষ্টি আওয়াজ শোনার জন্য সারা মন্দিরে সেন্ট্রাল মিউজিক সিস্টেম, পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য টিভি ক্যামেরার সাহায্যে Surveillance System এবং Paging System। শীতকালে র‍্যাম্পের ঢালে এবং বৈকুন্ঠের পরিক্রমার রাস্তায় বরফ গলাবার জন্য রাস্তার নিচে থাকবে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় আবহাওয়া নামলেই এটা নিজে থেকে শুরু হয়ে রাস্তাটাকে গরম করে দেবে বরফগুলোকে গলাবার জন্য। গলা শেষ হলেই আবার বন্ধ।

'ইউনিক অ্যাপ্লিকেশন' বলে অনেক জায়গায় গতানুগতিক সতকর্তা নেওয়া চলবে না। যেমন আরতি করার সময় ধুনোর ধোঁয়ায় স্মোক ডিটেক্টরগুলি মিথ্যা সংকেত দিতে পারে। তার মানে এই ঘরে স্মোক ডিটেক্টরের এর বদলে হিট ডিটেক্টর রাখতে হতে পারে – যাতে ধোঁয়ার বদলে, আগুনের ছন্টাটা একটা পূর্ব-নির্দিষ্ট তাপে নড়েচড়ে ওঠে। এ বাদেও রয়েছে ছোটখাটো সমাধানহীন ঝামেলা। যেমন শীত এলেই পদ্মফুল মারা যাবে, তুলসীগাছ মারা যাবে, ফোয়ারায় জল জমে যাবে – ইত্যাদি।

মন্দিরের লাইটিং ডিজাইনটা আমার কাছে শিহরণের। ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ারিং বা ফিজিক্সের একটা অংগ হলেও, লাইটিং ডিজাইন হচ্ছে বিজ্ঞান এবং কলার একটা ব্যালান্সড সংমিশ্রণ। হয়ত এই জন্যই ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ার হয়েও লাইটিং ডিজাইন করতে আমার এত ভাল লাগে। ব্যাপারটা আর একটু বুঝিয়ে বলি। বিজ্ঞান আমাদের হাতে অসংখ্য রকমের লাইট সোর্স তুলে দিয়েছে এবং সংগে দিয়েছে নানা রকমের প্রয়োগ পদ্ধতির গাণিতিক ফর্মুলা। কিন্তু লাইটিং ডিজাইন শুধু একটা পূর্বনির্দিষ্ট আলোর মাত্রাকে (লাইট লেভেল) পূর্ণ করাই যথেষ্ট নয়। এটা করতে হবে এমনভাবে যাতে – প্রথমত তা পরিবেশকে 'নিরাপদ' করতে পারে এবং দ্বিতীয়ত 'সুন্দর' করতে পারে। 'সুন্দর' কথাটা পুরোপুরি কলার পর্যায়ে পড়লেও এর মানেটা কিন্তু আরও অনেক গভীর। লাইটিং ডিজাইনের সৌন্দর্য শুধু চাক্ষুষ মনোরঞ্জনের জন্যই নয় – মানসিক এবং দৈহিক পরিতৃপ্তির জন্যও বটে – যা শুধু



নব বৃন্দাবনে চৈতন্যদেবের বিশাল মূর্তি তৈরি হচ্ছে


"এমন চমৎকার কোয়ালিটি
এত কম দরে
পেলে বেশী খরচা
করতে যাব কোন দুঃখে!"
Rajani Prabhakar
টি ভি স্টার বিপ্লবীনী রজনী (প্রিয়া তেণ্ডুলকর)


চমৎকার
কোয়ালিটি
—অথচ ২৫%
থেকে ৩০%
দামে কম।
Ezee
SUPER DETERGENT by Godrej
NEW SUPER BIZ
multipurpose CLEANING POWDER
NEW Action Plus KEY
BLUE DETERGENT BAR
NEW Trilo

চম্ক দিয়ে বোঝান যায় না। শুধু আলোকে খলি চোখে দেখা যায় না – কোন জিনিসের ওপর আলো পড়লে সেই জিনিসটিকেই আমরা দেখি। সুতরাং লাইটিং ডিজাইনের সফলতার অধিকাংশটাই নির্ভর করছে সেই জিনিসটির চেহারাটি কেমন এবং তাকে পরিস্ফুট করতে আলোর ব্যবহার কেমন হয়েছে তার ওপর। যেমন, দেয়ালে টাঙানো শুধু একটি ছবিকে ঠিকমত আলোকিত করতে গেলে জানতে হবে ছবির বিষয়টা কী, তার রঙ কী কী, ছবির পাশে বা ব্যাকগ্রাউন্ডের ফিনিশিংটা কী রকম, রিফেলকটিভ ব্রাইটনেসটা কিরকম, লাইট সোর্স-এর কালার রেন্ডিশনগুলি ছবির উপযুক্ত কিনা, দর্শকেরা কেমন – তাদের বয়স কিরকম কোথা থেকে দেখছেন ইত্যাদি। থ্রি ডাইমেনশনাল বিষয়কে (যেমন কোন মূর্তিকে) লাইটিং করতে গেলে আরও দেখতে হবে কোন ডিরেকশন থেকে আলোগুলি এলে তার বক্তব্যকে ঠিকভাবে ফোটান যাবে – এবং অনর্থক ছায়া পড়বে না। মন্দিরে প্রচুর অর্নামেন্টাল কারুকার্য রয়েছে। এগুলি এমনভাবে আলোকিত করতে হবে যাতে, হাতে করা প্রতিটি কারুকার্যের সূক্ষ্মবিষয়কেও প্রকাশ করা যায় আলো ও ছায়ার মাধ্যমে। 'এফেক্ট'-এর জন্য ব্যবহৃত লাইটগুলিকে 'অ্যাম্বিয়েন্ট ইল্যুমিনেশন'-এর জন্য ব্যবহারের প্রয়োজন হবে কিনা সেটাও যাচাই করতে হবে জায়গা বুঝে। 'অ্যাম্বিয়েন্ট ইল্যুমিলেশন'-এর জন্য ব্যবহৃত আলো নিজেরাও ঘরের আসবাব পত্রের মত 'ডেকর' হতে পারে – কিংবা সম্পূর্ণ লুক্কায়িত থাকতে পারে। মন্দিরে অনেক জায়গা আছে, যেখানে এমনভাবে আলো ব্যবহার করতে হবে যাতে সব কিছু সুন্দরভাবে দেখা যাবে, অথচ কোন সোর্সকে দেখা যাবে না। আর এ বাদেও আছে আলোর সোর্সের কালার রেন্ডিশন-এর প্রশ্ন। আসবাবপত্রকে বা পরিবেশকে যত সুন্দরই দেখাক না কেন দর্শকদের নিজেদের স্কিন কালার 'কমপ্লিমেন্টিং' না দেখালে, লাইটিং ডিজাইনের-এর সফলতা কখনই পূর্ণ হবে না। 'কালার কারেক্টেড' ফসফার না ব্যবহার করলে ফ্লুরেসেন্ট মেটাল হ্যালিড এমনকী নিওন লাইট এরও এটি একটা বড় সমস্যা। স্তম্ভ-এর নিচে দাঁড় করান সারি সারি মূর্তিগুলিকে এমনভাবে আলোকিত করতে হবে যাতে প্রতিটির সলিডিটি, মুখের অভিব্যক্তি, এবং হাতের কারুকার্যের সূক্ষ্ম অঙ্গগুলিকে ভালভাবে প্রকাশ করা যায়। প্রতিটি মূর্তিই প্রায় ৩০ ফুট উঁচু – লাইটগুলিকে এমনভাবে ঢেকে রাখতে হবে যাতে বাইরে থেকে দেখা না যায় বা অযাচিত


নামকীর্তনে সাদা-কালো ভেদ নেই

আলো এসে দর্শকের চোখ ঝলসে না দিতে পারে। মেঝের খাঁজে করা গেলে সুবিধা হয়ত হত – কিন্তু শীতকালে বরফ পড়ে ঢেকে যাবে। 'সংগীত স্তম্ভের' ওপর সূর্যরশ্মির সংগে কৃত্রিম আলোর সংমিশ্রণটা একটা বিশেষ চ্যালেঞ্জ। সূর্যরশ্মি ঢুকবে ছাদের ওপরে লাগানো রঙীন কাচের স্কাই-লাইট দিয়ে। ভেতরে যে সোর্সগুলির ব্যবহার হবে তার সার্কিটিং এমন করতে হবে যাতে সূর্য মেঘের আড়ালে গেলে বা মেঘলা দিনে আলো কমে গেলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে কৃত্রিম লাইট সোর্সগুলি (হাই ইনটেনসিটি ডিসচার্জ) বেশি আলো দিয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ করতে পারে। আলোর রঙ মিশ্রণও আরেক সমস্যা। সকালবেলার রোদের সংগে দুপুরবেলার রোদের রঙের প্রচুর তফাৎ। কৃত্রিম আলোর রঙটাও সংগে সংগে মানানসই করাতে হবে।

কীর্তনঘরের বিশাল আলোর ঝাড়টাকে এমনভাবে ডিজাইন করছি যাতে যথেষ্ট অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট দিতে পারে অথচ নিজে বেশি উজ্জ্বল হয়ে অন্য আলোর রং কমিয়ে না দেয়। ঝালরের ওপরে ডোম-এর গায়ের সূক্ষ্ম কাজগুলিকে প্রকাশ করবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। একাধিক লুকোন লাইটের এবং ডিমিং সুইচের মাধ্যমে এমনভাবে সেট করতে হবে, যাতে মন্দিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংগে ঘরের পরিবেশকেও বদলান যায়। এসব ছাড়াও আছে বিদ্যুৎ বাঁচাবার বিবেচনা। দেবঘরের জন্য ব্যবহৃত প্রচুর ভাস্বর দীপ এবং ঘরের অন্যান্য আলোর থেকে বের হওয়া তাপকে অনবরত টেনে নিতে হবে ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের-এর অনর্থক বোঝা কমানর জন্য। শীতকালে আলোর এই বাড়তি তাপকে বাড়ির হিটিং সিস্টেমে পুনর্ব্যবহারও (recycle) করা যেতে পারে।

নব বৃন্দাবনের অতিথি. ভবনে বসে রাত্রিবেলায় শোবার আগে এটি লিখছি। অনেক এলোমেলো চিন্তা মাথায় আসছে। আমেরিকাতে আছি প্রায় চোদ্দ বছর হল। এই দীর্ঘ চোদ্দ বছরে মার্কিন সরকারের হয়ে এবং বেসরকারি সংস্থার হয়ে আমেরিকার প্রচুর শহরের রাস্তাঘাট, শিল্প, গগনচুম্বী বাড়ি,আর্ট মিউজিয়ম এবং বিমান বন্দর থেকে শুরু করে মেক্সিকোর স্কুল, কলেজ হাসপাতাল, কানাডার লাস্যময় হোটেল এবং সৌদি আরবের সুলতানদের একাধিক বৃহদাকার প্যালেসকে আলোকিত করার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু নব বৃন্দাবনের এই কৃষ্ণমন্দিরের মত বহুমুখী এবং সারা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিষয়কে আলোকিত করতে মনে যে আনন্দ, শিহরণ ও তৃপ্তির স্বাদ পাচ্ছি তা আগে কখনও পাইনি পশ্চিম জগতের লোকজন তাদের পশ্চিমী সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে মাথার চুল কামিয়ে কপালে চন্দনের তিলক কেটে এবং গেরুয়া বেশ পরে ভারতবর্ষের ধর্ম ও শিক্ষাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে নিচ্ছে ভাবতেই ভাল লাগছে। বিদেশে আলোর ডিজাইন করতে এসে এ যেন নিজের আধ্যাত্মিক আলোর সংগে পরিচয় পাওয়া। মা, বাবার কাছ থেকে এবং দেশের স্কুল কলেজ থেকে দেশের আদর্শ ও শিক্ষা যা পেয়েছি – সেগুলিকে লাইটিং এঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে আমেরিকার কৃষ্ণমন্দিরে প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। □

ফটো : সংগৃহীত



গেলারের মনের ক্ষমতায় বাঁকা চামচ

না ছুঁয়েই চামচ বেঁকিয়ে দেওয়া, বা ভাঙা ঘড়ি হাত দিয়ে না ধরে বেমালুম সারাই করে দেওয়া – এ-ও হয় নাকি ? অন্তত পৃথিবীতে কয়েকজন দাবি করেছেন হ্যাঁ, এরকম হয়। তাঁরা বলছেন, সেটা হয় অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাবে। অবশ্য তাঁদের এ কথাকে যে সবাই মেনে নিয়েছেন, সেরকম মনে করার কোন কারণ নেই। এ বিষয়ে দ্বিধা এবং সংশয় অনেকের মনেই থাকতে পারে। তবু অতীন্দ্রিয় শক্তিমান মানুষদের কাহিনী পড়তে কিন্তু কারোরই খারাপ লাগবে না।

উরি গেলার এরকমই একজন মানুষ। অদ্ভুত শক্তিমান এই মানুষটিকে নিয়ে লিখেছেন অদ্রীশ বর্ধন।

উরি গেলার অতীন্দ্রিয়বাদী হল কীভাবে ?

১৯৭৪-এর বসন্তকাল। বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশকদের ঘোষণা থেকে জানা গেল, খুব শিগগিরই বাজারে আসছে চাঞ্চল্যকর একটা বই। লিখেছেন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং প্যারাসাইকোলজিস্ট ডক্টর অ্যানড্রিজা পুহারিখ। বই খানার নামটাই এমন যে, পড়েই বিক্রির সম্ভাবনা আঁচ করে ফেলেছিল বই বিক্রেতারা। 'উরি : এ জার্নাল অব দি মিস্ট্রি অব উরি গেলার' – নামের মধ্যেই বিপুল কৌতূহল !

কৌতূহল তো হবেই। বছর-খানেক আগে থেকেই যে দারুণ সাড়া ফেলেছে উরি গেলার অত্যাশ্চর্য টেলিপ্যাথির ক্ষমতা দেখিয়ে। টেলিপ্যাথির চাইতেও অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়েছে শুধু আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে চামচ বেঁকিয়ে, ভাংগা ঘড়ি মেরামত করে দিয়ে। তারপর ইউরোপ আর আমেরিকা পর্যটনে বেরিয়ে তাজ্জব করেছে বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিকে – রাতারাতি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক বাদানুবাদের। অকাল্ট বিষয়ক যে কোন বইয়েরই এখন বাজার গরম – বেরতে না বেরতেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বইটির নাম আর বিষয় দুটির সংযোগ তা যে বেস্ট-সেলার হয়ে দাঁড়াবে, এ আর আশ্চর্য কী!

উরি গেলার ! কিংবদন্তির নায়ক উরি গেলার! অথচ বয়সে সে নেহাতই তরুণ। জন্ম ইজরাইলে। খ্যাতি সাইকিক হিসাবে।

বইখানা যথা সময়ে বেরল ঠিকই, কিন্তু প্রত্যাশা মত লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল না। অসম্ভবকে যেন সম্ভব করে ফেলেছেন পুহারিখ, এমনই একখানা বিস্ময়কর আর অবিশ্বাস্য বই লিখেছেন যা কেউ পড়তেই চায়নি। এমন কী সমালোচনাগুলো পর্যন্ত হতাশ করে দেওয়ার মত; সমালোচকদের ধারণা যেন পুহারিখ অত্যন্ত অন্যায় চালাকি খেলেছেন। অথচ বৈজ্ঞানিক হিসেবে যথেষ্ট সম্মান পেয়েছেন পুহারিখ। আলডাস হাক্সলির মতে পুহারিখ হলেন 'প্যারাসাইকোলজি গবেষকদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট, তাঁদের অন্যতম'। পুহারিখের লেখা 'বিয়ন্ড টেলিপ্যাথি' বইখানা অনুসন্ধানী বিজ্ঞান-ভাবনার ক্ষেত্রে একটা ক্লাসিক গ্রন্থ। তা সত্ত্বেও ইজরায়েলের তরুণের সংস্পর্শে আসতেই ধুলোয় মিশে গেল ভদ্রলোকের সমস্ত নাম যশ! উরি গেলার যেন তাঁর বিচারবুদ্ধির নাশ ঘটিয়ে ছাড়ল স্বল্পসময়ের মধ্যে।

পুহারিখ যা বলতে চেয়েছিলেন, তা এই : উরি গেলারকে বলা যায় স্বর্গীয় বার্তাবাহী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁর হাতের যন্ত্র। রহস্যময় এই সত্তার উদ্দেশ্য একটাই – পৃথিবীতে শান্তি আর সমৃদ্ধি আনা।

সাধারণ পাঠকরা কিন্তু আশা করেছিলেন, পুহারিখ যখন লিখেছেন, তখন নিশ্চয়ই বইতে থাকবে বিস্তর সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৃত্তান্ত; সাইকিক এনার্জি সম্পর্কে বেশ কিছু জোরাল এবং মৌলিক তত্ত্ব। স্পেসশিপ আর অপার্থিব প্রাণীদের ব্যাপারস্যাপার

…শ করল প্রত্যেককে এই ধরণেই।

পুহারিখকে অতটা নস্যাৎ করাটা ঠিক হবে না। বইখানা একটু অদ্ভুত ঠিকই, তবে যতখানি মনে করা হয়েছিল, ততখান নয়। যে ঘটনাগুলোর কথা তিনি লিখেছেন সেগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে মানতেই হবে তাঁর সিদ্ধান্তগুলোও যুক্তিসংগত – আর একটু হুঁশিয়ার হলে হয়ত ভাল হত। যে কাহিনী তিনি লিখেছেন, সংক্ষেপে তা এই

১৯৫২ তে পুহারিখ একজন হিন্দু পন্ডিতকে যাচাই করে দেখছিলেন। ক্লেয়ারভয়্যান্ট শক্তি ছিল এই পন্ডিত মানুষটির। আচম্বিতে ভর হল ভদ্রলোকের ওপর এবং অদ্ভুত গলায় পরিষ্কার ইংরেজি উচ্চারণে কথা বলা আরম্ভ করলেন। 'নটা নীতি আর শক্তি'র প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে জাহির করেছিলেন বিচিত্র কণ্ঠস্বরে – 'নটা নীতি আর শক্তি' হল এমনই কিছু অতিমানবিক ধীশক্তি যারা চায় মনুষজাতটার ক্রমবির্বতন ঘটুক।

চার বছর পর মেক্সিকোয় এক ডাক্তারের দেখা পান পুহারিখ। মহাকাশের সত্তা'দের সংগে ভদ্রলোকের স্ত্রীর যোগাযোগও নাকি ঘটেছে ভর হওয়া একজন মিডিয়ামের মাধ্যমে।

কিছুদিন পর এই ভদ্রলোকই দুটো বার্তা' পাঠিয়েছিলেন পুহারিখকে। বার্তা' দুটো এসেছে 'মহাকাশ সত্তা'দের কাছ থেকে – পুহারিখকে দেওয়ার জন্যে। বার্তায় বলা হয়েছে, হিন্দু পন্ডিতের মাধ্যমে যে 'নটা নীতি' অনেক কথা বলে গিয়েছিলেন পুহারিখের সংগে, মহাকাশের এই সত্তারা আসলে তাঁরাই। পুহারিখের সংগে আবার তাঁদের যোগাযোগ ঘটবে – যথাসময়ে!

ঘোর সন্দেহ হয়েছিল পুহারিখের। ডাক্তার ভদ্রলোক নিশ্চয়ই হিন্দু পন্ডিতের খবরটা শুনে তাঁকে ধাপ্পা মারছেন। আসলে কিন্তু মোটেই তা হয়নি।

১৯৬০-এ ব্রেজিলের 'সাইকিক সার্জন' আরিগোর অদ্ভুত কীর্তিকলাপ দেখে চমৎকৃত হন পুহারিখ। আরিগো একজন অতি সাধারণ খনিশ্রমিক। হঠাৎ একদিন ভর হল তাঁর ওপর। খপ করে তুলে নিলেন একটা ছুরি। অপারেশন শুরু করে বসলেন এমন এক মহিলার দেহে যার মৃত্যুর আর দেরি নেই। ক্লোরোফর্ম কিংবা বেদনানাশক ওষুধপত্র অথবা জীবাণু শোধন না করেই হল অপারেশন তড়িঘড়িভাবে। কিন্তু কাজ হল ম্যাজিকের মত। যাকে বলে সাকসেসফুল অপারেশন ঠিক তাই। আনাড়ি আরিগো তখন শল্যচিকিৎসার চেম্বার খুলে শয়ে শয়ে অপারেশন করে গেলেন। মরচে ধরা একটা ছুরি দিয়েই বেশির ভাগ অপারেশন করতেন আরিগো – ছুরি মুছে সাফ করতেন নিজের শার্টে। কোন কাটাছেঁড়াই বিষিয়ে যায়নি। অ্যান্টিবায়োটিক অথবা জীবাণুনাশক দাওয়াই ছাড়াই সেরে গেছে প্রতিটি ক্ষত। ব্যর্থ হননি একবারও।

চমকপ্রদ এই কীর্তিকলাপের মূলে রয়েছেন নাকি একজন মৃত জার্মান শল্যচিকিৎসকের বিদেহী সত্তা – বলেছিলেন আরিগো। আরিগোকে আশ্রয় করেই তিনি কেরামতি দেখিয়ে যান বেপরোয়াভাবে।

পুহারিখ এলেন আরিগোর কাছে। দেখালেন তাঁর কাটাছেঁড়ার নমুনা। পুহারিখের হাতের একটা টিউমার পরিষ্কারভাবে কেটে বাদ দিয়ে দিলেন আরিগো।

কিন্তু পুহারিখের কপাল মন্দ। ১৯৭১-এর জানুয়ারিতে মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেলেন আরিগো। মুষড়ে পড়লেন পুহারিখ। এই আশ্চর্য পুরুষের জীবদ্দশাতেই তাঁকে নিয়ে পুরো সময় অনুসন্ধান করা উচিত ছিল তাঁর।

আরিগো যখন মারা গেলেন, তার কিছুদিন আগে ইজরায়েলের এক তরুণের অবিশ্বাস্য শক্তি-কাহিনী শুনেছিলেন পুহারিখ। ছেলেটা নাকি না ছুঁয়েই ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিতে পারে। যে কোন লোকের আঙুলের আংটি ভেঙে দু টুকরো করে দিতে পারে আঙুল শুধু হাতটার দুপাশে নিজের দুহাত রেখে।

পুহারিখ ঠিক করলেন এবারে আর সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। চিঠি লিখলেন উরি গেলারকে। তারপর ইজরায়েলে গেলেন তার সংগে দেখা করতে। পরে গেলারকে নিয়ে এলেন আমেরিকায়।

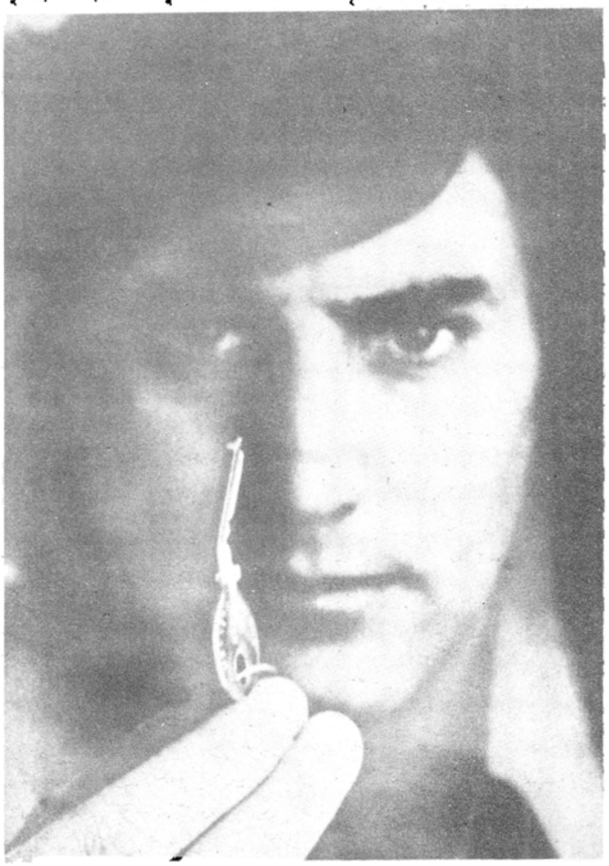
একদিন একটা ঘটনা ঘটল। মৃদু সম্মোহনী আবেগে রয়েছে গেলার। আচম্বিতে শূন্যপথে ধ্বনিত হল একটা অদ্ভুত ধাতব স্বর। কথা বলছে নাকি এক ধরনের অতিমানবিক (বা অমানবিক) সত্তা। নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে যন্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে গেলারকে।

পরে আরো 'বার্তা' এল এই অদৃশ্য সত্তাদের কাছ থেকে। জানা গেল, এরাই সেই 'নটা সত্তা', বিশ বছর আগে যাদের খবর প্রথম পেয়েছিলেন পুহারিখ। এরা থাকে নাকি স্পেস আর টাইমের বাইরে অন্য এক ডাইমেনশনে। মানুষ জাতটার ওপর নজর রেখেছে বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে। সেই মুহূর্তে ওরা রয়েছে 'স্পেকট্রা' নামে 'নক্ষত্রজাহাজে'র মধ্যে – মহাশূন্যের কোনো এক জায়গায়। আমরা যাকে উফো বা ফ্লাইংসসার বলি, তা এদেরই কীর্তি। এদের মূল উদ্দেশ্য, মানুষ যেন নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে না ফেলে এবং পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করে।

ধাতব স্বরটা নাকি মহাকাশ-সত্তাদের নিজেদের স্বর নয় – ইলেকট্রনিক্স মারফৎ সৃষ্ট। পুহারিখ টেপরেকর্ড করে নিয়েছিলেন কথাবার্তা। কিন্তু প্রতিবারেই রহস্যজনকভাবে মুছে গেছে টেপের কথা। উফোর যে সব ফটো তুলেছিলেন গেলার অথবা পুহারিখ সেগুলোকেও হয় ডেভলাপ করা যায়নি, অথবা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই অপার্থিব সত্তারা নিজেদের অস্তিত্বের আর শক্তির প্রমাণ দিয়ে গেছে নানাভাবে; কখনও গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ফের চালু করে দিয়েছে; পুহারিখের ব্রিফকেস আমেরিকা থেকে ইজরায়েলে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ফলে, সমালোচকেরা হতভম্ব হলেন, ঘাবড়ে গেলেন, এবং কয়েক ক্ষেত্রে ক্ষেপে গেলেন। দোষ দেওয়া যায় না ভদ্রলোকদের! ধরে নেওয়া হল, পুহারিখ হয় পাগল হয়ে গেছেন, নয়ত তিনি ধাপ্পা মারছেন। সাইকিক কান্ডকারখানা নিয়ে চুটিয়ে লিখতেন ডি স্কট রোগো নামে এক ভদ্রলোক। তিনি রেগেমেগে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিলেন পুহারিখকে। স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক রাশি রাশি বোগাস ব্যাপারকে বিশ্বাস করতে বলছেন

কিন্তু একটারও প্রমাণ হাজির করছেন না কেন? ফটোগ্রাফি আর টেপের বার্তা ভ্যানিশ করে দেওয়ার মত মোক্ষম চালিয়াতি আর আছে নাকি! ফ্লাইং সসারের ভেতরে বেড়িয়ে এসেছেন অথবা উড়নচাকির চালকদের সংগে প্রাণের কথা বলেছেন – এমনি ফালতু গপ্পকথা তো অনেক শোনা যায় – উরি গেলারকেও মহাকাশের দূতেরা যেন সেই ছকে বাঁধা গালগপ্পের মত নিজেদের



ছবি বেঁকিয়েছে গেলার

হাকিন্স সবচেয়ে নিরাপদ
সবচেয়ে তাড়াতাড়ি চমৎকার রান্নায় নেইকো জুড়ি



* উপরে ৬.৫ লিটার স্ট্যাণ্ডার্ড বেস মডেল-এর ছবি দেখানো হয়েছে।

সুস্বাদু রান্নার সুচিন্তিত উপায়

প্রেসার কুকারে রান্না করলে সময় ও জ্বালানী দুটোই বাঁচে। এ ভাবে রান্নার ফলে বিশেষ বিশেষ আহার্যে পুষ্টিগুণ আরও বেশিমাত্রায় বজায় থাকে, বিশেষ করে প্রোটিন ও ভিটামিন। প্রত্যেকটি কুকারের সঙ্গে একটি করে হকিন্সের ১২৭-টি রুচিকর রন্ধনপ্রণালীসমেত একটি বই, বাংলা ও আরও ১১-টি মনোমত ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়।

হকিন্সে সবচেয়ে চট করে রান্না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে এর অধিকতর সাশ্রয়কর গঠনবিন্যাস এবং বাষ্প চলাচলের বিস্তৃত পরিসর।
পরীক্ষায় দেখা গেছে যে হকিন্স ব্যবহার করলে প্রতি বছর প্রায় ৩০০ টাকার জ্বালানী খরচ বেঁচে যায়।

আপনার সেরা নিরাপত্তার জন্যই হকিন্স

হকিন্স দুর্ঘটনা-প্রতিরোধক। এর ঢাক্‌না ভিতর দিকে আট্‌কানো থাকে আর ভিতরকার গরম ভাপের চাপ আস্তে আস্তে ক'মে গেলে তখনি কেবল ঢাকনাটি খোলা যায়। হকিন্সের সেফ্‌টি ভাল্‌ভটি হাতলের নীচের দিকে লাগানো থাকায় গরম ভাপ ঠিক্‌রে নিরাপদভাবে নীচের দিকে নেমে যায়।

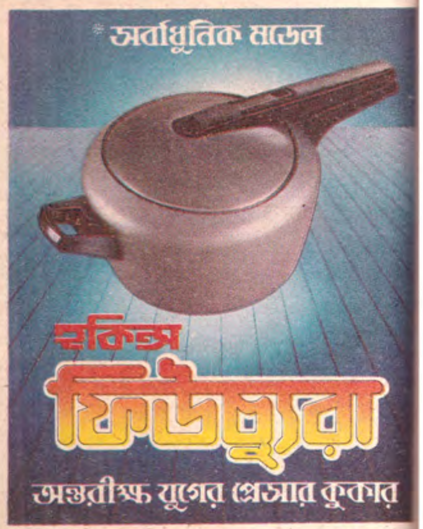
প্রত্যেকটি হকিন্স কুকারকে কোয়ালিটি কণ্ট্রোলের কড়াকড়ি পরীক্ষায় নিখুঁত বলে প্রমাণিত হ'তে হয় এবং প্রত্যেকটি কুকারের সঙ্গে ৫ বছরের লিখিত গ্যারাণ্টী দেওয়া হয়/ কুকার কেনার পরেও ১৪৪-টি অধিকৃত সার্ভিস সেণ্টার বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞের সার্ভিস দেবার ও আসল স্পেয়ার পার্টস যোগাবার জন্য সর্বদা সানন্দে প্রস্তুত রয়েছে।

সবচাইতে টেঁকসই সামগ্রীটি পাচ্ছেন —৩৮-টি মডেলে

ঢাক্‌না প্রত্যেকবার খুলবার অথবা বন্ধ করবার সময় পাশ থেকে ঘষা লাগে না বলে হকিন্সের রবারের গ্যাসকেট অনেক বেশিদিন টেঁকে। মামুলি রবারের তৈরি সেফ্‌টি ভাল্‌ভের চেয়ে হকিন্সের ধাতুর তৈরি সেফ্‌টি ভাল্‌ভের আয়ু অনেক বেশি। সেরা পাতের প্লেটিং থাকার ফলে মরচে ধরে না। পৃথিবীর সবচেয়ে রকমারি প্রেসার কুকারের বিপুল সম্ভার থেকে নিজেরটি বেছে নিন— ২ থেকে ২২ লিটার* পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের ৩৮-টি মডেল পাবেন, সেপারেটর ছাড়া অথবা সেপারেটর সমেত, স্ট্যাণ্ডার্ড অথবা হেভী বেস্‌-এ, তাপকুশল অ্যালুমিনিয়ম অথবা চিরউজ্জ্বল স্টেনলেস স্টীলে, কিংবা অনন্য 'স্যাটিলনে' যাতে এই দুই-এরই সুযোগ-সুবিধে রয়েছে।

আপনার বাছাইয়ে সাহায্য করার জন্য বিনামূল্যে পুস্তিকা

আপনার সবচেয়ে কাছের হাকিন্স ডীলারের ঠিকানা পাওয়ার জন্য এবং ৩৮-টি আকর্ষণীয়, সুন্দর হকিন্স মডেলের বিশদ বিবরণসহ বিনামূল্যের রঙীন পুস্তিকা পাবার জন্য, এখানে লিখুন: হকিন্স, বিভাগ ১৩১
পোঃ আঃ বক্স ৬৪৮১, বোম্বাই ৪০০ ০১৬।



হকিন্স

সেরা জাতের প্রেসার কুকার...যাতে আপনার রান্না হবে চ-ম-ৎ-কা-র!

প্রতিনিধি নির্বাচন করে বসে আছেন! বাঃ! কিন্তু প্রমাণ কোথায়? গোটা বইখানায় এমন কিছু নেই যা নিয়ে যাচাই করা যায়! ফুঃ! – এমনি নানা কথা লিখে গেলেন স্কট।

কথাগুলো নির্জলা সত্যি। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান তো ঘটছে না, বরং আরো জট পাকিয়ে যাচ্ছে। পুহারিখ যদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যাই বলবেন তো এমন কাঁচা মিথ্যে বলতে যাবেন কেন? উরি গেলারকে যিনি বিশ্বের সবচাইতে অসাধারণ সাইকিক হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চান, তিনি তো ভালভাবেই তা করতে পারতেন নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক্সপেরিমেন্টগুলোর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে – সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারতেন অনায়াসেই। কেন তা করলেন না? কয়েকটা এক্সপেরি-মেন্ট কিন্তু সত্যি সত্যিই পিলে চমকে দেওয়ার মত। যেমন, ছোটখাট জন্তুদের হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়ে অন্যত্র প্রেরণ। 'স্পেকট' ঘটিত ব্যাপারগুলো লেখার কোনও দরকারই ছিল না। লোকে তাঁর বই কীভাবে নেবে, তা বোঝার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি নিশ্চয় ছিল পুহারিখের – সততার অকাট্য প্রমাণ হাজির না করলে প্রতিক্রিয়াটা যে মোটেই ভাল হবে না– তা কি জানতেন না পুহারিখ? কার্যত ঘটলও তাই কষ্ট করে লেখা বইখানা কদর পেল না কোন মহলেই।

পুহারিখ যে বাজে কথার মানুষ নন, বানিয়ে বলার মানুষ নন, তা কিন্তু আগেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল তাঁরই লেখা 'দ্য সেকরেড মাশরুম' বইখানা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সেই তাঁর প্রথম গ্রন্থ এবং রীতিমত আশ্চর্য গ্রন্থ। এই বইতেই তিনি হ্যারি স্টোন নামে এক তরুণ ভাস্করের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা বিজ্ঞানসম্মতভাবে যাচাই করার পর লিখেছেন। জাতে ওলন্দাজ এই তরুণটি মাঝে মধ্যেই প্রেতাবেশে বেহুঁশ হত, গড় গড় করে সুপ্রাচীন মিশরীয় ভাষায় কথা বলে যেত, মিশরীয় সাংকেতিক ছবি– হরফ অক্লেশে লিখে যেত। স্টোনের ওপর ভর করত রা হো টেপ নামে চতুর্থ রাজবংশের একজন মিশরবাসী। পুহারিখ হ্যারি স্টোনকে নিয়ে অতিশয় হুঁশিয়ারভাবে বৈজ্ঞানিক তদন্ত চালিয়েছেন – যা নিয়ে বকেছিলেন এবং লিখেছিলেন তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ বা অস্পষ্টতা একেবারেই নেই। বিশ্বাস না করে কেউই পারেনি, বৈজ্ঞানিককে যে নির্দয় হতে হয় এসব ব্যাপারে, হ্যারি স্টোনের ক্ষেত্রে পুহারিখ তো তা দেখিয়েছেন। লেখার এই অসাধারণ গুণ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'বিয়ন্ড টেলিপ্যাথি' কেতাবেও। এই বইতেও তিনি টেলিপ্যাথি, বিদেহী সত্তা এবং 'অ্যাস্ট্রাল ট্র্যাভেল'-এর অনেক ঘটনা তুলে ধরেছেন। অ্যাস্ট্রাল ট্র্যাভেল মানে নিজের দেহের বাইরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান আর গণিত বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে 'সাই প্লাজমা'র অস্তিত্ব সপ্রমাণ করবার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সাই প্লাজমা-কে সাধারণ মানুষ বলতে পারে 'মন-বস্তু'। পুহারিখ দেখিয়েছেন কীভাবে দুটো মানুষের মনের মধ্যে সাই প্লাজমা সক্রিয় হলে সাইকিক কান্ডকারখানা সম্ভব হয়। পুহারিখ যে আসলে বৈজ্ঞানিকের ছদ্মমুখোশ পরে গোপনে অকাল্ট সায়ান্সের চর্চা করে চলেছেন, এই দুখানা বই না পড়লে তা বিশ্বাস হবে না কারুরই।

মনের মধ্যে এই সব কারণেই একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে, পুহারিখই কি ঠিক? সত্যিই কি হাজার হাজার বছর ধরে 'মহাকাশ সত্তা'রা পৃথিবীর ওপর নজর রেখে চলেছে? উরি গেলারের জৈব গঠন পছন্দসই হওয়ায় তারাই কি তাকে 'প্রেরক যন্ত্র' হিসেবে কাজে লাগিয়েছে? নাকি এর পেছনে এমন কোনো রহস্য আছে আজও যার হদিশ আমরা পাইনি?

প্রশ্নগুলো নিয়ে তলিয়ে ভাববার আগে বাদানুবাদের কেন্দ্রবিন্দু যে মানুষটা, সেই উরি গেলারের জীবনটাকে জানা যাক।



সিগনাল পোস্ট বেঁকিয়ে দিয়েছে গেলার

বিস্ময়কর পুরুষ উরি গেলার

উরি গেলার নামটা কিন্তু হাঙ্গেরি দেশের। গেলারের বাবার নাম ইটঝাক, মায়ের নাম মার্গারেট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই দুজনে পালিয়ে যান হাঙ্গেরি থেকে। এখন যার নাম ইজরায়েল, সেই প্যালেস্টাইনে পৌঁছোন ১৯৪০-এ। বৃটিশ আর্মিতে যোগ দিয়ে নর্থ আফ্রিকায় রোমেলের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে যান ইটঝাক গেলার। ১৯৪৬ এর ডিসেম্বরে তেল আভিভে জন্ম হয় উরি গেলারের। অন্য এক মহিলার প্রেমে পড়েন ইটঝাক গেলার ফলে আগের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার সূচনা ঘটে।

উরি গেলারকে জেরায় জেরায় অস্থির করে তুলেছিলেন কলিন উইলসন নামক সেই বিখ্যাত লেখক, যিনি অকাল্ট সায়ান্সের ওপর মোটা মোটা বই বার করে আজ বিশ্ববিখ্যাত। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি আর রাটগার্স ইউনিভার্সিটিতেও অধ্যাপনা করেছেন বহুদিন।

গেলারের শক্তির উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন কলিন উইলসন। একটাই ঘটনা মনে পড়েছিল গেলারের। এতই তুচ্ছ ঘটনা যে নিজেও তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি, কাউকে আগ বাড়িয়ে বলতেও যায়নি।

ঘটনাটা গেলারের কাছে তুচ্ছ মনে হলেও শুনলে কিন্তু অদ্ভুত লাগে। ওর মায়ের একটা সেলাই কল ছিল। ক্ষুদে একটা গর্ত ছিল মেশিনের গায়ে। গর্তের মধ্যে দিয়ে গেলার দেখতে পেত খুবই পুঁচকে একটা নীল স্ফুলিঙ্গ। পাঁচ বছর বয়েসে একদিন আঙুল গলিয়ে স্ফুলিঙ্গটাকে ছোঁওয়ার চেষ্টা করেছিল গেলার। সাংঘাতিক শক খেয়ে উল্টে পড়েছিল পেছনে।

গেলারের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে কিন্তু ঠিক এর পর থেকেই। হঠাৎ একদিন গেলারের খেয়াল হল, মায়ের মনের কথা বুঝতে পারছে অনায়াসেই। মা হয়ত বান্ধবীদের সঙ্গে তাস খেলে বাড়ি ফিরছে, তাসের বাজি জেতা টাকাও রয়েছে সঙ্গে – গেলার মাকে দেখা মাত্র বুঝতে পারত ঠিক কত টাকার বাজি জেতা হয়েছে সেদিন। গেলারের মুখে টাকার অঙ্ক শুনে তাজ্জব হয়ে যেত মা। আরও দেখা গেছে, মা হয়ত কোন কথা বলব বলব করছে, মুখখোলার আগেই গেলার হুবহু বলে দিয়েছে মা কী কথা বলতে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। এ ধরনের টেলিপ্যাথি-যোগাযোগ অনেক বিবাহিত দম্পতির মধ্যে দেখা যায়। বাবা-মা আর ছোট্ট ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এ ঘটনা আকছার ঘটে। কলিন উইলসন নিজেও তাঁর শিশু সন্তানদের ঘুম ভাঙিয়ে দিতেন স্রেফ মনে মনে হুকুম দিয়ে।

গেলারের ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর



মিউনিখে কেবল কার থামিয়ে দিচ্ছে গেলার

কান্ডকারখানা শুরু হয় ওর ছ বছর বয়েসে। বাবার কাছ থেকে একটা ঘড়ি পেয়েছিল গেলার। একদিন ক্লাসে গিয়ে দেখল ঘড়িটা আধঘন্টা এগিয়ে চলছে। কাঁটা ঘুরিয়ে ঘড়ি ঠিক করে রাখল গেলার। কিন্তু বার বার আধঘন্টা এগিয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবল নিশ্চয় কোন ব্যারাম হয়েছে ঘড়ি বাবাজীর। কিন্তু কী আশ্চর্য! স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়িমুখো রওনা হতেই ঘড়ি আবার চলতে লাগল কাঁটায় কাঁটায়!

এরপর একদিন ঘড়িটাকে সামনে রেখে চেয়ে রইল গেলার। অবাক কান্ডটা দেখা গেল তখনই। কাঁটা ঘুরছে বাঁই বাঁই করে। যে গতিবেগে ঘোরা উচিত, তার চাইতে অনেক বেশি গতিবেগে। নিশ্চয় গুরুতরভাবে বিগড়েছে ঘড়ি। বাবার কাছে বায়না ধরল গেলার – নতুন ঘড়ি চাই। কিন্তু নতুন ঘড়ির কাঁটা দুটো এমনভাবে বেঁকে গিয়ে কাঁচে আটকে গেল যে ঘড়িই আর চলল না!

এরও কিছুদিন পরে ঘড়ি না নিয়েই ক্লাসে বসে আছে গেলার, পাশের ছেলেটি হঠাৎ কাঁউমাউ করে বললে তার ঘড়ি নাকি এক ঘন্টা এগিয়ে গেছে। দুষ্টু বুদ্ধি সুড়সুড় করে উঠল গেলারের মগজে। বললে মুচকি হেসে – "আমিই এগিয়ে দিয়েছি।" বলেই বন্ধুর ঘড়ি হাতে নিয়ে মনঃসংযোগ করে রইল কিছুক্ষণ এবং যে ভাবেই হোক, ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিল বেশ খানিকটা। হৈ হৈ পড়ে গেল ক্লাসে। স্কুলের বন্ধুদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল উরি গেলারের নামযশ।

তার পরেই শুরু হল চামচ বেঁকে যাওয়ার পিলে চমকানো ঘটনা। চামচ দিয়ে একদিন সুপ খাচ্ছে গেলার, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ হাতল ভেঙে দু-টুকরো! মায়ের সংগে প্রায়ই কফি খেতে যেত গেলার একটা দোকানে। হঠাৎ দেখা গেল দোকানের সমস্ত চামচ বেঁকে যাচ্ছে আপনা থেকেই – গেলার কিন্তু ছোঁয়নি কোনটাই!

মহাচিন্তায় পড়লেন গেলারের পিতৃদেব। ঠিক করলেন ছেলেকে নিয়ে যাবেন মনের ডাক্তারের কাছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু নিয়ে যাননি। মন ঘুরে গেছিল। ভুল করেছিলেন সেইখানেই। খোলা মন নিয়ে কোন মনের ডাক্তার যদি গেলারকে পরীক্ষা করতেন, আশ্চর্য কীর্তিকলাপের মূলে যে প্যারানর্মাল ফোর্স-সমূহ কাজ করে চলেছে, নিশ্চয় আঁচ করে নিতে পারতেন। উরি যে পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে জোচ্চুরি করছে না, তাও যাচাই করে নিতেন। প্যারানর্মালি কান্ডকারখানায় মনের ডাক্তারের আগ্রহ থাকলে উপযুক্ত অনুসন্ধানের আয়োজনও করতেন। উরি গেলারের জীবনে চামচ বেঁকে যাওয়ার ব্যাপার শুরু হয় ১৯৫৫তে। ঐ সময় সবাই কিন্তু জানতো, যেসব বাড়িতে ছেলেমেয়েরা অথবা কিশোর-কিশোরীরা মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন, তথাকথিত 'পোলটারজিস্ট' উপদ্রব দেখা যায় সেই সব বাড়িতেই (দুষ্টু প্রেতাত্মার বাড়ির বস্তু ছোঁড়াছুঁড়িকেই বলা হয় 'পোলটারজিস্ট' উপদ্রব)।

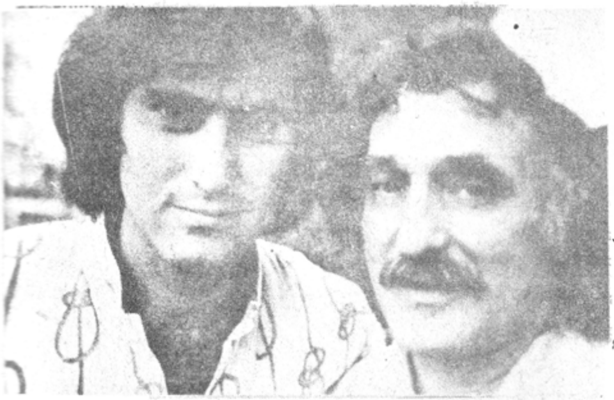
উরির জীবনেও সেই সময়ে নিরাপত্তার অভাব দেখা গেছিল খুব বেশি – 'অন্য এক মহিলা' কে নিয়ে প্রায়ই উধাও হয়ে যেতেন পিতৃদেব। কাজে কাজেই পোলটারজিস্ট অনুমিতিই যুক্তিযুক্ত হত নিঃসন্দেহে। পনের বছর পরে অ্যানড্রিজা পুহারিখের নজরে পড়ার আগেই উরির অদ্ভুত শক্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান পর্বও শুরু হয়ে যেত পুরোদমে। বিচিত্র প্রহেলিকায় আদৌ আলোকপাত ঘটত কিনা, তা অবশ্য বলা যাচ্ছে না।

ইজরায়েলে ইহুদি সম্প্রদায়ের চাষী প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় কিবুটস। বাবা আর মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যেতেই গেলারকে পাঠিয়ে দেওয়া হল তেল আভিভ এর কাছে একটা কিবুটস-এ। গেলার নিঃসংগ জীবন কাটিয়েছে এখানে। দারুণ খুশি হয়েছে মা আবার বিয়ে করায়। সৎ-পিতা হাংগেরির মানুষ পিয়ানোবাদক। তিনজনে মিলে গেছে সাইপ্রাসে। যুদ্ধাতংকের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে গেলারকে সেখানে – এবারের যুদ্ধ সাইপ্রাসের গ্রীক আর তুর্কিদের মধ্যে। সাইপ্রাসেই স্বইচ্ছায় এই প্রথম নিজস্ব শক্তি প্রযোগ করেছে গেলার। গ্যারেজে ছিল একটা সাইকেল। সৎ-পিতা কথা দিয়েছিলেন গেলারই উপহার পাবে দ্বিচক্রযানটা বিশেষ একটা উৎসব উপলক্ষে। ততদিন নম্বরী তালা দেওয়া অবস্থায় সাইকেল থাকুক গ্যারেজে। উরির বড় সাধ তার আগেই সাইকেল চালাবে। একদিন মনের জোর প্রযোগ করল তালার ওপর। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে খুলে ফেলল তালা। শিখে নিল সাইকেল চালাতে হয় কীভাবে।

হার্ট-অ্যাটাক হল একদিন উরির সৎ-পিতার। খবরটা জানা ছিল না উরির। কিন্তু অদ্ভুত একটা মানসিক তাগিদ ওকে টেনে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। পৌঁছেছে ঠিক সেই ঘরে যেখানে বাবার বিছানার পাশে বসে রয়েছে মা। নিশ্চয় মায়ের সংগে টেলিপ্যাথি-যোগাযোগ ছিল বলেই মনের ভেতর থেকে হাসপাতালে যাওয়ার তাগিদ পেয়েছিল উরি 'চালিত হয়েছিল' ঠিক জায়গাতেই। মায়ের সংগে উরির টেলিপ্যাথি-যোগাযোগ প্রবল ছিল কিন্তু বরাবর। নিজেই বলেছে কীভাবে একদিন মা গাড়ির দুর্ঘটনায় জখম হওয়ার সংগে সংগে টের পেয়েছিল অনেক দূরে তেল আভিভে বসেই। ঘন্টাকয়েক পরে যাচাই করে নিয়েছিলো 'টের পাওয়াটা' ভুল নয় – সত্যিই জখম হয়েছে মা দূরের এক শহরে।

সাইপ্রাসে উরিকে পড়াশুনোর জন্যে পাঠান হয় একটা রোমান ক্যাথলিক স্কুলে। খুবই খারাপ লেগেছিল উরির। এইখানেই একটা ঘটনার মাধ্যমে উরি বেশ বুঝতে পারে টেলিপ্যাথি-বার্তা শুধু গ্রহণ নয়, প্রেরণ করাও সম্ভব তার পক্ষে। স্কুলের নিয়ম অগ্রাহ্য করে ছেলেরা প্রায়ই অভিযানে যেত স্কুলের কাছেই একটা পাহাড়ের গুহা অঞ্চলে। একাধিক অত্যন্ত গভীর গুহা আছে জায়গাটায়। একদিন সাহসে বুক বেঁধে উরি প্রবেশ করেছিল একটা গুহার গহনে – পথ গুলিয়ে ফেলায় বেরতে পারেনি। কিন্তু ঘাবড়ায়নি মোটেই। অন্ধকারে পাথুরে মেঝেতে বসে প্রার্থনা করে গেছিল একমনে। এক ঘন্টা পরে কানে ভেসে এসেছিল কুকুরের ডাক। দশ মাইল দূরের নিকোসিয়া থেকে ছুটে এসেছে বাড়ির কুকুর – খুঁজে খুঁজে ঠিক পৌঁছেছে উরির কাছে অন্ধকার গুহায়। দুজনে খেলা করেছে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর কুকুরই ওকে পথ চিনিয়ে বার করে এনেছে গুহার গোলকধাঁধার বাইরে।

অচিরেই উরি দেখল, পরীক্ষার সময়েও নিজের টেলিপ্যাথির ক্ষমতা বেশ কাজ দিচ্ছে। যে কোন একজন ভাল ছাত্রের মাথার পেছনদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেই নিজের নাকি মাথার মধ্যে টেলিভিশন পর্দায় ছবি ফুটে ওঠার মত দেখতে পেত সবকিছু। ভাল ছাত্রও ভুল লেখে – উরিও হুবহু সেই ভুল উত্তর লিখে যেত নিজের খাতায়। সন্দেহ হল শিক্ষকদের। নিশ্চয় টুকলিফাই করছে উরি। সুতরাং তাকে বসান হল ঘরের এক কোণে – অন্য ছাত্রদের থেকে বেশ তফাতে। দূরত্ব সত্ত্বেও উরি সঠিক উত্তরের সংগে ভুল উত্তরও লিখে গেল আগের মত। উরি শুধু হাত ঠেকিয়ে চাবি বেঁকিয়ে দেয়, ঘড়ি মেরামত করে দেয় – শিক্ষকরা তা জানত। তাই নিশ্চয় সন্দেহ করেছিল, ছেলেটা অদ্ভুত কিছু ঘটিয়ে চলেছে পরীক্ষা দিতে বসেও। অনেক বছর পরে



বাঁদিকে গেলার, ডানদিকে পুহারিখ

মিসেস জুলি আর গোটিস নামে এক ভদ্রমহিলার একখানা চিঠি ছাপা হয় বৃটিশ সংবাদপত্র 'নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এ। স্কুলে উরিকে ইনি পড়িয়েছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই চামচ বেঁকানো শুরু করে উরি – এ চিঠি থেকেই তা জানা যায়। সৎ-পিতা হৃদরোগে মারা যেতেই ক্যাথলিক স্কুলে পড়াশুনা শেষ হয়ে যায় উরির।

সাইপ্রাসে থাকতেই ইজরায়েলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের সংগে জড়িয়ে পড়ে উরি। জোয়াভ নামের তার এক বন্ধু ইজরায়েলি স্পাই-এর কাজ করত। নিকোসিয়ায় গোপন খবর লেনদেন করার কাজ চায় বালক উরি। কাজটা পাইয়ে দেয় জোয়াভ। মা-কে নিয়ে তেল আভিভে চলে আসতেই ইতি হয়ে যায় গুপ্তচরবৃত্তির। কিন্তু সামরিক কাজ চালিয়ে যায় উরি ছত্রী বাহিনীতে নাম লিখিয়ে। সবচেয়ে অদ্ভূত অভিজ্ঞতা লাভ করে তখনই। একটা ভারি ব্রাউনিং মেশিনগান বয়ে নিয়ে যাওয়ার হুকুম পেয়েছিল উরি। প্রথমদিনে নিশ্চয় গুলিবর্ষণের দরকার হবে না, এই ভেবে ভারি পার্টগুলো নিয়ে যায়নি সংগে – ফেলে গেছিল ব্যারেল আর ফায়ারিং পিনও। কিন্তু আচম্বিতে হুকুম এল গুলিবর্ষণ করতে হবে কাল্পনিক শত্রুর বিরুদ্ধে। দ্রুত ভেবে নিয়ে একটা ছোট বন্দুক ফিতেয় বাঁধা ব্রাউনিং-এর পাশে রাখল উরি – ভেবেছিল কেউ অত লক্ষ্য করবে না। কিন্তু ছোট বন্দুকের ট্রিগার টেপার সংগে সংগে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেছিল দুটো বন্দুক থেকেই। পরে এক অফিসার অভিনন্দন জানিয়ে গেল উরিকে অভিনব শুটিংয়ের জন্যে। ব্রাউনিং ঘিরে পড়ে থাকা খালি গুলির খোল-গুলো দেখে তাজ্জব হয়ে গেছিল অনেকেই। ব্যারেল অথবা ফায়ারিং পিন ছাড়াই গুলিবর্ষণ করে গেছে ব্রাউনিং মেশিনগান! আজব কান্ড নিঃসন্দেহে!

১৯৬৭তে শুরু হয়ে গেল ইজরায়েল বনাম মিশর লড়াই – ছদিনের যুদ্ধ। উরি কিন্তু পূর্বসংকেত পেয়েছিল মনের মধ্যে – যুদ্ধে জখম হবে গুরুতরভাবে, তবে মৃত্যু হবে না। হলও তাই। গ্রেনেড বিস্ফোরণে হাত, পা আর কপাল ছেয়ে গেল বোমার টুকরোয়। সেরে উঠতে না উঠতেই চাকরি জুটে গেল তেল আভিভে-এর কাছে ছেলেমেয়েদের ছুটি কাটানোর শিবিরে। শিপি নামে একটি ছেলের সংগে ঘনিষ্ঠতা জন্মায় এখানে এবং উরির পরবর্তী জীবনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন হয়ে দাঁড়ায় এই শিপি। শিপিই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে উরিকে দিয়ে দক্ষিণার বিনিময়ে ক্ষমতা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে নিজের স্কুলে।

সেই প্রথম জনসমক্ষে ক্ষমতার খেল দেখাল উরি। দুঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে মনের কথা পড়ে নেওয়া, ঘড়ির মেরামত করা আর চামচ বেঁকিয়ে দেওয়ার খেলা দেখিয়ে গেল উরি এবং থ করে ছাড়ল দর্শকদের।

১৯৬৮ তে সামরিক বাহিনী ছেড়ে দেয় উরি। তারপর কী করা যায়, এই ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষমতার খেলা দেখিয়ে যায় নানা জায়গায়। আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয় তখনই। ক্ষমতার খেলা প্রদর্শনকেই জীবিকা করে নিলে কেমন হয়? ব্যস, মনস্থির হয়ে গেল সংগে সংগে। দুদিন যেতে না যেতেই নাম ছড়িয়ে গেল ভালভাবেই। এত ভালভাবে যে, একদিন এক পেশাদার ম্যানেজার খেলা দেখানর চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নিল উরিকে দিয়ে।

উরি প্রথম বিরাট ভুলটা করে বসল এর পরেই। লোক ঠকাতে রাজি হল ম্যানেজারের তাগিদে। মঞ্চে ম্যাজিক দেখাতে গেলে

কৌশলের আশ্রয় নেয় সবাই সেদিক দিয়ে ব্যাপারটা প্রতারণা নয় নিশ্চয়। যেমন, গাড়ির লাইসেন্স প্লেটের নম্বর। এমন ভান করা হত যেন গাড়ির মালিকের মনের মধ্যে থেকে নম্বরটাকে জেনে নিয়েছে উরি। কিন্তু সত্যিই যার সাইকিক ক্ষমতা আছে, এই দাবি নিয়ে সে কৌশলের আশ্রয় নিলে যশ অপযশে পরিণত তো হবেই।

উরির জীবনেও তিক্ততা দেখা দিল প্রায় এই সময় থেকেই। রোমের একটা খেলা গেল ভন্ডুল হয়ে। সোফিয়া লোরেনের সংগে উরির একটা ফটো যে জোড়াতালি দিয়ে সবাইকে দেখান হচ্ছে, এই নিয়ে কেলেংকারি আর আটকান গেল না। ইটালিতে বিখ্যাত এই চিত্রতারকার সংগে উরি যখন দেখা করে, তখন দুজনের একসংগে ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি ফটোগ্রাফারকে। দুজনের দুটো ফটো পাশাপাশি লাগিয়ে জালিয়াতি করেছিল এই ফটোগ্রাফার মহাশয়। কিন্তু বদনামের ভাগী হতে হল উরিকে। যদিও প্রতারণায় বিন্দুমাত্র হাত ছিল না বেচারার।

১৯৭০-এ আমেরিকায় কর্মরত ইটঝাক বেনটভ নামে একজন ইজরায়েলি অতীন্দ্রিয় গবেষকের সংগে আলাপ হয় উরির। বেনটভের সামনেই অন্যের হাতে ধরা একটা ধাতুর আলপিন মনের শক্তি প্রয়োগ করে ভেঙে দুটুকরো করে দেয় উরি। টুকরো দুটো আমেরিকায় অ্যান্দ্রিজা পুহারিখের কাছে পাঠিয়ে দেয় বেনটভ। ফলে ইজরায়েলে ছুটে আসেন পুহারিখ উরির সংগে আলাপ করতে। উরি গেলারের রহস্যময় কীর্তিধন্য জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে তখন থেকেই।

অগাস্ট ১৭, ১৯৭১ তারিখে একটা নাচগানের আসরে প্রথম মোলাকাৎ ঘটে দুজনের। দর্শকদের মধ্যে বসেছিলেন পুহারিখ। পপগায়ক, ক্লাউন আর কৌতুকাভিনেতাদের পর স্টেজে এল উরি। হাততালি দিয়ে আর সোল্লাসে স্বাগতম জানিয়ে হলঘর ফাটিয়ে দেওয়ার উপক্রম করল তরুণ-তরুণীরা। ঘোষণায় জানা গেল, এইবার হবে টেলিপ্যাথি আর সাইকোকাইনেসিসের আজব খেলা! চোখ বেঁধে দেওয়া হল উরির। দর্শকরা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে গেল মনের মত শব্দ। চোখবাঁধা অবস্থাতেই উরি বলে গেল প্রতিটি শব্দ। টেলিপ্যাথি অর্থাৎ মনের কথা পড়ে নেওয়ার এই খেলার পরেই এক মহিলার আঙুলের আংটি ভেঙে দিল উরি ভদ্রমহিলার মুঠোর দুপাশে নিজের দুহাত রেখে। পুহারিখ কিন্তু পরে স্বীকার করেছিলেন, সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছিল নিশ্চয় কৌশল রয়েছে দুটো খেলার মধ্যেই। মানে, স্রেফ লোক-ঠকানো ব্যাপার সত্যিকারের সাইকিক এনার্জির খেলা নয়।

ভুলটা ভাঙল পরের দিন পুহারিখের নিজের ফ্ল্যাটে উরিকে যাচাই করার পর। গেলার নিজেই এক তা কাগজে একটা সংখ্যা লিখে পুহারিখকে বলল 0 থেকে ৯-এর মধ্যে যে কোন তিনটে সংখ্যাবাচক অংককে মনে মনে ভাবতে। পুহারিখের ভাবা হয়ে যেতেই কাগজটা দেখাল উরি। কী আশ্চর্য! পুহারিখ যা ভেবেছেন, তা আগেই ভেবেছে উরি এবং লিখে রেখেছে কাগজে! উরিই ভাবিয়েছে পুহারিখকে মনের চিন্তা টেলিপ্যাথি দিয়ে পাঠিয়ে!

পুহারিখের খর নজরের সামনেই গেলার আরও কিছু ক্ষমতার নমুনা উপস্থিত করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে। যেমন, একটা ঘড়িকে ইচ্ছে করে খারাপ করে আনা হল উরির সামনে, উরিকে ছুঁতেও দেওয়া হল না। কিন্তু ঘড়ি চালু হয়ে গেল আপনা থেকেই। একজন মুঠোর মধ্যে ধরে রইল একটা আংটি – বিয়ের আংটি। কিন্তু রেহাই পেলনা উরির প্রচন্ড সাইকেক এনার্জির খপ্পর থেকে – মুঠোর মধ্যেই মট করে ভেঙে গেল আংটি!

এরপরেও কি অবিশ্বাস থাকতে পারে পুহারিখের? উরির ক্ষমতায় যে ঠগবাজি নেই, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ আর রইল না মনের মধ্যে। স্রেফ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে একটা থার্মোমিটারের পারা আট ডিগ্রি ফারেনহাইট তুলে দিল উরি পুহারিখের বিস্মিত চোখের সামনে। পাশের আর একটা থার্মোমিটারের পারা দাঁড়িয়ে রইল ঠিক যেখানে ছিল সেখানেই।

আশ্চর্য এই ক্ষমতার ব্যাখ্যা-স্বরূপ কোনো তত্ত্ব কি জানা আছে উরির? পুহারিখের এই প্রশ্নের জবাবে উরি বলেছিল, এমনও হতে পারে, আলোর চাইতে বেশি গতিবেগে হয়ত টেলিপ্যাথির কাজটা ঘটে। আইনস্টাইন অবশ্য

করেছেন, এই বিশ্বে আলোর চাইতে বেশি গতিবেগে যেতে পারে না কিছুই। কিন্তু প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়মকে ভেঙে দিচ্ছে টেলিপ্যাথি নিজস্ব শক্তি দিয়ে। অথবা হয়ত 'মহাকাশের মানব'দের বংশধর উরি গেলার। তাদেরই প্রচন্ড ক্ষমতার কিছুটা এসেছে তার মধ্যে। কবে এসেছিল পৃথিবীতে এই মহাকাশ মানবরা? নিশ্চয় বহু বছর আগে। সবই ভাসাভাসা আন্দাজি কথা। দানিকেন রচিত 'চ্যারিঅটস্ অফ দ্য গড্স্' ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক দুবছর আগে প্রকাশের কিছু পরেই স্ট্যানলি কুব্রিকের ফিল্ম '২০০১ : এ স্পেস অডিসি' দেখেছিল অনেকেই। সুতরাং উরি যা বলে গেল, এই জাতীয় ধারণা গজগজ করেছিল অনেকেরই মগজের মধ্যে।

এরপরেই সব চাইতে আশ্চর্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার আসর বসল ১৯৭১-এর ১ ডিসেম্বর। এই দিনেই শূন্যপথে শোনা গেছিল কম্পিউটার কন্ঠস্বর। তার আগেই অবশ্য সম্মোহনী আবেশে রাখা হয়েছিল গেলারকে। ছেলেবেলার ঘটনা জানার জন্যে বেশ কয়েকটা প্রশ্নও করা হয়েছিল। সাইপ্রাসে যাওয়ার পর ইংরেজি শিখেছিল গেলার। তাই পুহারিখের প্রশ্নের জবাবগুলো দিয়ে গেছিল হিব্রুতে। তেল আভিভে ছেলেবেলার কথা বলার পরেই আচমকা বলেছিল অসাধারণ এক কাহিনী।

বয়স তখন তার মাত্র তিনবছর। বাড়ির সামনেই একটা বাগানে খেলছে উরি। হঠাৎ দেখতে পেল মাথার ওপর অনেক উঁচুতে আকাশে ঝকঝক করছে অত্যুজ্জ্বল বাটির মত একটা বস্তু। বাতাসে ভাসছে উচ্চগ্রামের একটা অতি-তীব্র গুন-গুন শব্দ! আলো নেমে এল আরও কাছে, চোখ ধাঁধিয়ে গেল গেলারের। তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছিল।

উরি' নামে যে বইটা লেখেন পুহারিখ, তাতে এই কাহিনীর দুটো সংস্করণ হাজির করেছিলেন। প্রথমটাতেই লিখেছিলেন, চকচকে মুখওয়ালা একটা মূর্তির মত কী যেন হাজির হয়েছিল উরির সামনে। মূর্তির মাথা থেকে আলোকরশ্মি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তিনবছরের উরির দিকে। রশ্মি সংঘাতেই নাকি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে উরি।

উরি কিন্তু 'মাই স্টোরি' নামে যে আত্মজীবনী লেখে, তাঁতে এধরনের কোন রহস্যজনক মূর্তির উল্লেখ করেনি। বাটির মত বস্তুর আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার পর যেন ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়েছিল চিৎপাত হয়ে। পুহারিখের ব্যাখ্যার চাইতে উরির ব্যাখ্যা অনেক কম অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়।

টেপরেকর্ডে ছেলেবেলার এই পিলে-চমকানো কাহিনী উরি বলবার পরেই শূন্যপথে শোনা গেছিল ধাতব কন্ঠস্বর। উরির তিনবছর বয়েসে বাগানে তাকে খুঁজে পেয়েছিল এরাই (নটা নীতি)। সঠিক তারিখটাও বলেছেন পুহারিখ – ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯। উরির জৈব-গঠন পছন্দ হয়েছিল বলেই 'নটা নীতি' তাকে বেছে নিয়েছিল উদ্দেশ্যপূরণের যন্ত্র হিসেবে। উরি নাকি 'গ্রাহক' যন্ত্র হিসেবে উত্তম – 'নটা নীতি'র বাণী গ্রহণ করতে পারবে সহজেই। তারা এসেছে পৃথিবীকে বিশ্বযুদ্ধের মাতামাতি থেকে বাঁচাতে। মিশর যা ফন্দী এঁটেছে, তার ফলে যদি ইজরায়েল পরাজিত হয় যুদ্ধে, তাহলে গোটা পৃথিবীটাই ফেটে পড়বে বিধ্বংসী যুদ্ধের তান্ডব লীলায়।

সম্মোহনী আবেশ কাটিয়ে ওঠার পর উরিকে টেপ বাজিয়ে শোনানো হয়েছিল। কিছুই নাকি মনে নেই উরির। স্বকন্ঠে বর্ণিত বাগানের ঘটনা শোনবার পর মন্তব্য করেছে – এরকম কোন ঘটনাই মনে পড়ে না আমার। ধাতব কন্ঠস্বর শুরু হতেই টেপরেকর্ড থেকে ক্যাসেটটা খুলে নিয়ে মুঠোর মধ্যে ধরে কিছুক্ষণ নিঝুম হয়েছিল উরি, পরক্ষণেই বেগে বেরিয়ে যায় ঘরের বাইরে। পুহারিখ লিখেছেন, উরি মুঠোর মধ্যে ধরার সংগে সংগে নাকি অদৃশ্য হয়ে গেছিল টেপখানা। পরে উরিকে পাওয়া গেছিল একটা শূন্য লিফটের মধ্যে মুহ্যমান অবস্থায়। টেপখানা আর পাওয়া যায়নি।

পুহারিখ অবাস্তব দুঃস্বপ্ন রচনা করে চলেছেন, সর্বসাধারণের এই ধারণাই হয়েছিল ওপরের অবিশ্বাস্য ঘটনাটা তাঁর বইতে পড়বার পর। 'নটা নীতি' আরও বাণী শুনিয়ে গেছে নাকি পরে, কিন্তু প্রতিটি টেপ মোছা অবস্থায় পাওয়া গেছে পরে বাজিয়ে শোনবার সময়ে। মহাশূন্যের রহস্যময় সত্তাদের বাণী স্বকর্ণে কেউ শোনেনি। মাঝেমাঝে নাকি ক্যাসেট রেকর্ডারি নিজে থেকেই 'কথা' বলে গেছে, অদৃশ্য শক্তি দিয়ে কে যেন রেকর্ডিং চাবি টিপে ধরেছে, কিন্তু প্লেব্যাক করতে গিয়ে দেখা গেছে টেপে কোন কথাই ওঠেনি!

সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের ফুর্তিতে রাখতে গেছিল উরি। সংগে ছিলেন পুহারিখ। ঘটনাস্থল একটা মরুভূমি। আর্মি জিপে বসে রয়েছেন পুহারিখ উরিকে নিয়ে। হঠাৎ দূরে দেখা গেল একটা লাল আলো। উড়ন চাকি বলেই অনুমান করে নিল দুজনেই। জিপ চালাচ্ছিল যে সৈনিক পুরুষরা তারা কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি।

বিশেষ নম্বর লেখা রিফিল সমেত একটা বল পয়েন্ট পেন রাখা হয়েছিল সিল করা একটা বাক্সে। কয়েক মিনিট পরে বাক্স খোলার পর দেখা গেল, পেনের মধ্যে থেকে রিফিলটা উধাও হয়ে গেছে। একটু পরেই মনের ভেতরে তাগিদ অনুভব করেছে উরি, পুহারিখকে নিয়ে গেছে তেল আভিভের এক



বাড়ির কাঁটাচামচ ইত্যাদি বেঁকে গেছে

শহরতলীতে। তখন রাত্রি। দুজনেই দেখেছে 'একটা নীলচে-সাদা আলোর গোলক জ্বলছে আর নিভছে' নির্জন একটা অঞ্চলে। যেন সম্মোহনের ঘোরে সেদিকে এগিয়ে গেছে গেলার। ফিরে এসেছে হাতে করে উধাও বল পয়েন্ট পেনের রিফিল নিয়ে! এই ধরনের বেশ কিছু তাজ্জব কাহিনী বইতে লিখে ছিলেন পুহারিখ। তাই লোকে ধরে নিয়েছে সবই অলীক ব্যাপার। পুহারিখের নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে।

১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ইজরায়েল থেকে রোমে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন পুহারিখ। কিন্তু যাওয়ার আগে তাঁর ওপর জোর তল্লাসি চালিয়ে গেল ইজরায়েলি ইনটেলিজেন্স অফিসাররা। বাজেয়াপ্ত করল বিস্তর ফিল্ম, বই আর চিঠি। পুহারিখ নাকি সুপারস্পাই। উরিও তো এককালে স্পাই ছিল। তাই স্পাইয়ের ওপর স্পাইগিরি করতে এসেছেন পুহারিখ।

রোমে পৌছে নিউইয়র্কে যোগাযোগ করতেই খারাপ খবরটা পেলেন পুহারিখ, লোকের ধারণা তিনি পাগল হয়ে গেছেন। উরি নাকি একটা অশুভ প্রতিভা। কাজকর্মে একটু ঢিলে দেওয়া দরকার মনে করলেন পুহারিখ। এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। পাহাড়ের ওপর একটা হোটেলে ডেরা নিয়ে লিখতে শুরু করলেন উরি সম্বন্ধে নিজের বই।

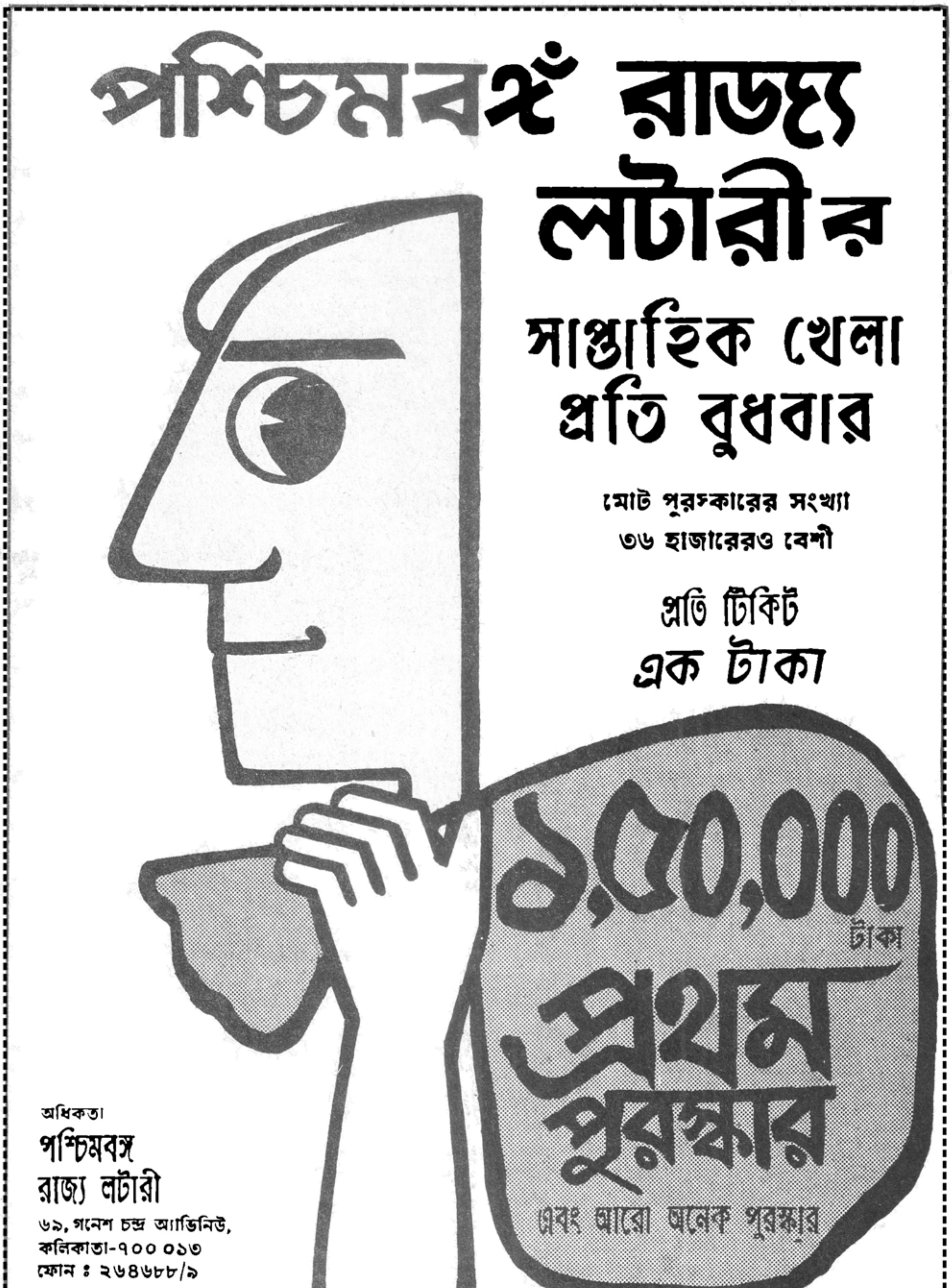
এদিকে উরি ইজরায়েলে বসেই অফার পেল – জার্মানিতে খেলা দেখাতে যেতে হবে। যে ভদ্রলোক উরিকে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন, পাবলিসিটির ক্ষমতা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাই বন্ধু শিপিকে নিয়ে উরি জার্মানির মাটিতে পা দিতেই ছেঁকে ধরল রিপেটার আর ফটোগ্রাফাররা। মিউনিখের একটা খবরের কাগজে ছ কিস্তিতে বেরল তার কীর্তি-কাহিনী। ম্যানেজারের ইচ্ছে ছিল, অদ্ভুত কান্ডকারখানা না দেখালেই নয়। উরি তাই থামিয়ে দিল পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত অবস্থায় চলমান একটা কেবলকার এবং মিউনিখের এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের একটা লিফট। এমনও হতে পারে দুটো ঘটনাই স্রেফ কাকতালীয়

কেবলকার আর লিফট দুটোই আপনা থেকেই থেমে যেত অনেকক্ষণ ধরে চালু থাকার ফলে – উরির ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হতনা। অবিশ্বাসীরা ব্যংগের সুরে এমন কথাও বলেছিল, কাটতি বাড়ানর জন্যে ওরকম খবর তো ছাপতেই হয় সংবাদপত্রে, কয়েকশো মার্ক ঘুষ দিয়ে কেবলকার আর লিফটও থামিয়ে দেওয়া যায়। তার জন্যে উরির অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার দরকার হয়না। বিশ্বাস অবিশ্বাসের এই ঝড়ে এবার কিন্তু উরির কোন ক্ষতি হয়নি, বরং নামটা আরও ছড়িয়ে পড়েছিল। ইজরায়েলে ফিরতে না ফিরতেই ডাক এল আমেরিকা থেকে। অনেক কিছু পরীক্ষা দিতে হবে ক্ষমতা সত্যিই আছে কিনা প্রমাণ করার জন্যে।

বিশ্বের সবচেয়ে খ্যাতিমান 'সাইকিক' হওয়ায় পথ প্রশস্ত হয়েছিল কিন্তু এই অগ্নিপরীক্ষার পর থেকেই!

উরি গেলার আজ একটা মূর্তিমান প্রহেলিকা সারা বিশ্বে! □

ফটো : সংগৃহীত



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
লটারীর
সাপ্তাহিক খেলা
প্রতি বুধবার
মোট পুরস্কারের সংখ্যা
৩৬ হাজারেরও বেশী
প্রতি টিকিট
এক টাকা
১,৫০,০০০
টাকা
প্রথম
পুরস্কার
এবং আরো অনেক পুরস্কার
অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য লটারী
৬৯, গনেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-৭০০ ০১৩
ফোন ঃ ২৬৪৬৮৮/৯
IPB/84

নন্দনকাননের লায়ন সাফারি

ভুবনেশ্বর বেড়াতে আসলে, এখান থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে নন্দনকানন চিড়িয়াখানা যদি না দেখেন, তবে কিন্তু পরে আফসোস থেকে যাবে। ভারতে এত সুন্দর, প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলীর চিড়িয়াখানা খুব কমই আছে।

আর নন্দনকানন আসলে এখানকার লায়ন সাফারি বা সিংহ পার্ক দেখতে ভুলবেন না। ভারতে যে ৫টি লায়ন সাফারি আছে (পাঞ্জাবের ছতবির, হায়দ্রাবাদ, বম্বের কাছে বোরিভিলি, বাঙালোরের কাছে বনরঘাটি আর নন্দনকানন) তার মধ্যে নন্দনকানন অনন্য। আকারে নন্দনকাননের লায়ন সাফারি সব থেকে বড়। এর আয়তন প্রায় ২০ হেক্টর। এর মত প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারতের আর কোন সিংহ পার্কের নেই। বনের সিংহকে এখানে রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ আরণ্যক এক পরিবেশে। আর সব থেকে উল্লেখযোগ্য, এখানে যে ১০টি সিংহ আছে (২টি বড় সিংহ, ৩টি বড় সিংহী, ৩টি বাচ্চা সিংহী ও ২টি বাচ্চা সিংহ) তার সবগুলিই আফ্রিকার সিংহ। চিকাগোর ব্রুকলিন চিড়িয়াখানার গাইড বুকে নন্দনকাননের কথা উল্লেখ করা আছে। লায়ন সাফারির ১০টি সিংহ সমেত নন্দনকাননে মোট ২৩টি সিংহ আছে।

১৯৮৪ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এই পার্কটির দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ২১ লক্ষ টাকা আর রাজ্য সরকারের ৬ লক্ষ টাকায় এই লায়ন সাফারি গড়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে কেন্দ্র সরকার সাফারি ঘুরে দেখার জন্য একটি বাসের বন্দোবস্ত করেছেন।

এই সিংহ পার্কের ভেতরে গেলে দেখতে পাবেন, পশুরাজ সিংহ নেহাতই শান্ত এবং গোবেচারার মত এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছে কিন্তু সত্যিই কি এরা এত শান্ত? সাফারি বেড়াতে আসা লোকজনের ওপর হঠাৎ হামলা করবে না তো? পার্কের দেখাশোনা করেন যে রেঞ্জার তিনি জানালেন, সিংহরা ক্ষুধার্ত না থাকলে বা কোন কারণে বিরক্ত না হলে সাধারণত মানুষের ওপর হামলা করে না। ১৯৫০ সালে ইংল্যাণ্ডে যখন প্রথম লায়ন সাফারি খোলা হয়েছিল তখন সাফারি দেখতে আসা এক ভদ্রমহিলার ওপর একটি সিংহ আক্রমণ করেছিল। এ নিয়ে বেশ সোরগোল হয়েছিল। তবে পরে জানা গিয়েছিল যে, ওই ভদ্রমহিলা বাসের জানলা খুলে সিংহদের হাতছানি দিচ্ছিলেন।

সিংহরা যাতে পার্কের বাইরে বেরিয়ে না আসতে পারে তার জন্য পার্কের চারদিকে উঁচু তারের বেড়া দেওয়া আছে। এছাড়াও একটি বিদ্যুৎবাহিত তারের বেড়াও দেওয়া আছে।

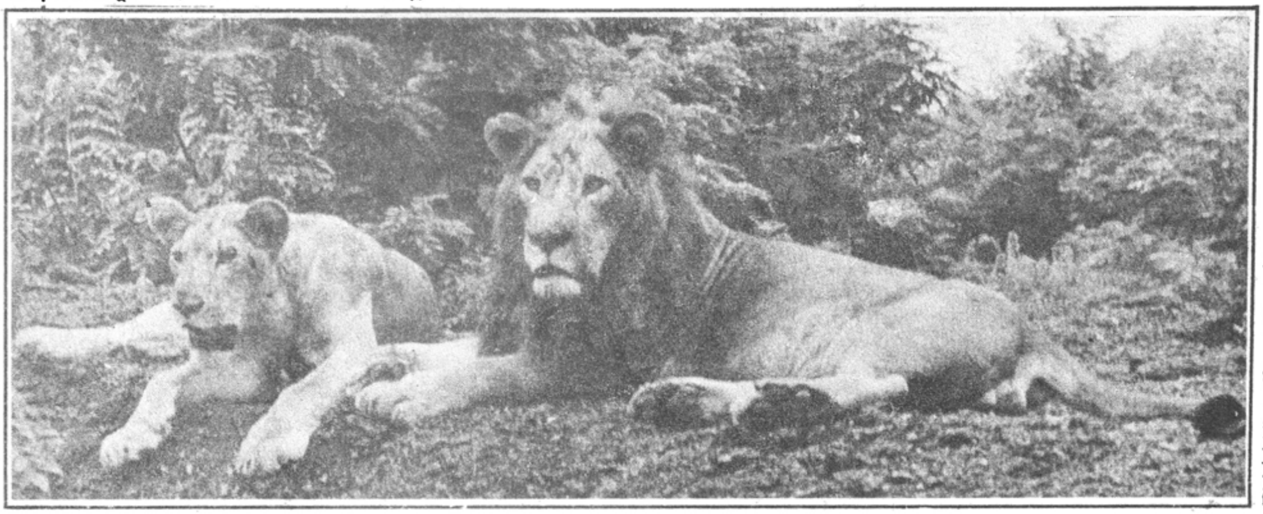
বনের পশুকে পার্কে বন্দী করে রাখা নিয়ে পশু প্রেমিকরা মুখ ভার করতে পারেন। তাঁদের অবগতির জন্য এখানকার একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানালেন যে, জঙ্গলে সিংহ সাধারণত ১০ থেকে ১২ বছর বাঁচে। কিন্তু এইরকম পার্কে এরা ২০ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

নন্দনকানন লায়ন স্যাফারিতে কিছু খরগোশ আর বাদরও রাখা হয়েছে, সিংহদের শিকারের অভ্যাস ঠিক রাখার জন্য। অবশ্য এছাড়াও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সিংহদের রোজ খেতে দেন। তবে সপ্তাহের সোমবার দিনটি এদের কিছু খেতে দেওয়া হয় না। সংরক্ষণ অফিসার এস কে পট্টনায়ক জানালেন, এটা ডাক্তারদের পরামর্শ। সিংহদের রাত্রে থাকার জন্য আর ঝড় বৃষ্টিতে মাথা গোঁজার জন্য পার্কের মধ্যে দশটা ঘর করা হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘণ্টা বাজলেই সিংহরা গুটি গুটি চলে আসে এই ঘরের ভেতর।

নন্দনকাননের লায়ন সাফারি কেবল ট্যুরিস্টদের জন্য নয়। এখানে সিংহদের গতিবিধি, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদির ওপর গবেষণা করা হচ্ছে।

এখন পৃথিবীতে সিংহদের সংখ্যা কমে আসছে। ভারতে গুজরাটের গির অরণ্যেও এককালে অনেক সিংহ ছিল। এখন কিন্তু এই সংখ্যা ভীষণভাবে কমে গেছে। শেষ গণনা অনুসারে এখন ভারতে সিংহের সংখ্যা মাত্র ২৫০। তাই নন্দনকাননের সিংহদের বংশবৃদ্ধির জন্যও বনজন্তু সংরক্ষণ বিভাগ চিন্তা করছেন। ☐

মৃণাল চট্টোপাধ্যায়



লায়ন সাফারিতে সিংহ দম্পতি। ফটো: রঞ্জন মিত্র

বামনরাও চাঁদে হাত দেয়

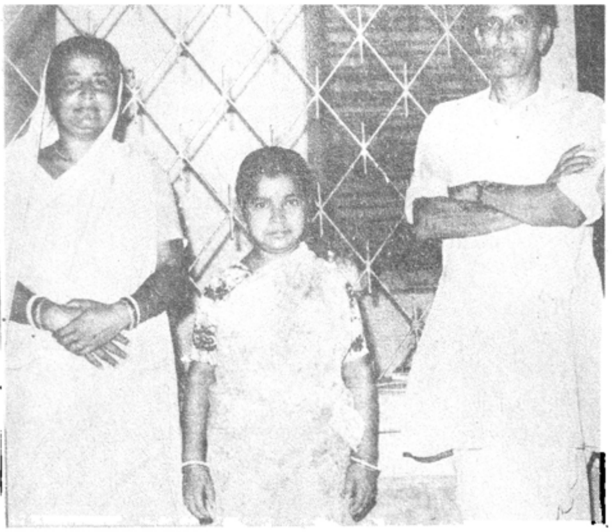
ভূত দেখার মতই ভড়কে গিয়েছিল রাজা প্রথম চার্লস। রানীর কোলে দাঁড়িয়ে বেপরোয়া চুমুতে তাকে বেসামাল করে দিচ্ছে হাতখানেক লম্বা একটি লোক। রানীও অপ্রস্তুত। রাজার তো এই ভর-সন্ধ্যায় বাগানে আসার কথা নয়। রানী সে যাত্রা কৌশলে রাজাকে ট্যাকল করেছিলেন। বলেছিলেন, 'বান্ধবীর ছেলে। বড় দস্যি।' লোকটি মোটেই কিন্তু ছেলেমানুষ নয়। পঁচিশ বছরের উত্তপ্ত জোয়ান। ইতিহাসের ভেতরের পাতা ঘাঁটলেই তার দেখা পাওয়া যাবে। জিওফ্রি হাডসনের উচ্চতা ছিল মাত্র বাইশ ইঞ্চি। তার সঙ্গে চার্লসের একবার ডুয়েলও বেঁধে গিয়েছিল প্রায়।

এ পর্যন্ত সবচেয়ে খর্বকায় মানুষটির নাম জানেন? হিলানি আজিবা। একটি কাফ্রি মেয়ে। পনের ইঞ্চি এই মেয়েটিকে দেখে রাজা কফেচুয়ার চওড়া বুকটি আরো চওড়া হয়ে উঠেছিল। হ্যাভলক এলিস হয়তো বলবেন ওটা মনের বিকৃতি। কিন্তু এই পুতুলটিকে নিয়ে খেলতে খেলতে কফেচুয়ার খিটখিটে মেজাজটি দরিয়া হয়ে উঠত। স্পেনের রাজদরবারে বামনদের যথেষ্ট

খাতির ছিল। ভেলাসকোয়ের আঁকা অনেক ছবিই তার দলিল হয়ে আছে। শুধু স্পেনেই নয় ইউরোপের অনেক রাজদরবারেই বামনদের ভিড় দেখা গেছে। তাদের বিচিত্র শরীর রাজা-রানীদের মনে কৌতুক সঞ্চার করত। খেলনার মতই রাজা-রানীরা তাদের নিয়ে ছেলেখেলা করে আনন্দ পেতেন। আর এই ছেলেখেলা করতে করতেই মাঝে মাঝে ফাস্ট-নাস্ট দুষ্কর্ম-গুলো ঘটে যেত অনেকটা দুর্ঘটনার মতই।

আমেরিকার উইলিয়াম রবিনসন বামনদের নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। বামনদের তিনি দু' শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক শ্রেণীর বামন যাদের পিটুইটারি গ্লাণ্ড ঠিকমত কাজ করে না। এরা দেখ-তেও মোটামুটি কদাকার। আচার-আচরণেও নির্বোধ। জন্মকালে এদের আকৃতিতে সাধারণত কোন বিকৃতি থাকে না। কিছুকাল পরে কোন কঠিন ব্যাধির প্রকোপে দেহের স্বাভাবিক বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যায়। আরেক শ্রেণীর বামন আছে যাদের পিটুইটারি গ্লাণ্ডের কাজ অতি স্বাভাবিক। এবং কথায় ব্যবহারে নির্বোধ তো নয়ই বরং সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেকেই বেশ বুদ্ধিদীপ্ত, রস-কুশলী। এই বামনদের আবার আরো দুটো পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নানাভাবে বিকৃত। জন্মসূত্রেই এরা বিকৃত-অঙ্গ। বয়স বাড়লেও এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব একটা বেড়ে ওঠে না। অপর শ্রেণীর বামনরা সাধারণ মানুষের চেয়ে পরিমাপে ছোট হলেও তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিকৃত বলা যায় না। শৈশব থেকেই খুব ধীর লয়ে তাদের অঙ্গের বিকাশ ঘটলেও সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক আকার লাভ করতে পারে না কখনই।

বিকৃত অঙ্গ বামনদের অধি-কাংশই প্রজনন ক্ষমতায় বঞ্চিত থাকে। কিন্তু যারা শুধুই খর্বকায় —খুব ধীর লয়ে হলেও যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে ওঠে অথচ সাধারণ মানুষের আকার পায় না, তাদের যৌনজীবন সুস্থ ও স্বাভাবিক। এ ধরনের বামনরা সাধারণ বা বামন যাকেই বিয়ে করুক তাদের সন্তানের স্বাভাবিক গঠন না পাবার কোন কারণ নেই। রবার্ট স্কিনার নামে এক বামনের দৈর্ঘ্য ছিল পঁচিশ ইঞ্চি। তার বিয়ে



মা ও বাবার সঙ্গে স্বপ্না। ফটো : সুপ্রিয় নাগ

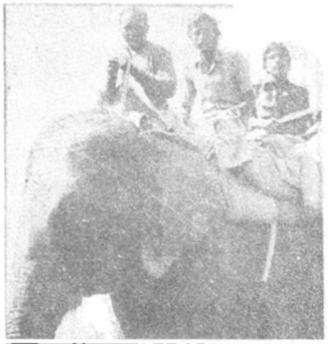
হয়েছিল ছাব্বিশ ইঞ্চি লম্বা এক বামনীর সঙ্গে। তারা চোদ্দটি ছেলেমেয়ের জন্ম দেয়। সকলের স্বাভাবিক গড়ন। কেউ বামন হয়নি। আফ্রিকার 'পিগমী' উপ-জাতিদের দৈর্ঘ্য মোটামুটি চার ফিট থেকে চার ফিট দশ ইঞ্চির মত। এদের ঠিক বামন বলা যায় না। কারণ এদের দৈহিক হ্রস্বতা শারীরিক নয়। জাতিগত।

বামনরা সাধারণত দীর্ঘজীবী হয় না। তবে এর ব্যতিক্রমও কম নেই। এক ফরাসী বামনের সঙ্গে দোস্তি গড়ে উঠেছিল পোল্যাণ্ডের রাজা স্ট্যানিসলসের। উনত্রিশ ইঞ্চি লম্বা এই লোকটি ভালবেসে ছিলেন তিরিশ ইঞ্চি এক বামনীকে। কিন্তু মাত্র বাইশ বছর বয়সেই অমোঘ মৃত্যু তাঁকে পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে যায়। প্রিয়তমের বিরহে পুড়ে পুড়েও মেয়েটি বেঁচে ছিল দীর্ঘ তিয়াত্তর বৎসর। মেরী জোনস নাম্নী এক বামনী জীবন-ক্রিকেটে নাকি সেঞ্চুরি করেছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে ঐতিহাসিক বামনটির নাম বোধহয় রিশেবুর্গ। ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে আছে নানাভাবে। সরকারের গোপন বার্তাগুলো মুখস্ত করে সেগুলো ফাঁস করে দেওয়া ছিল তার কাজ। মেয়েদের কোলে কোলে সে ঘুরে বেড়াত। সরকারের জাঁদরেল কর্মকর্তারাও বাচ্চা ছেলেটি মনে করে দ্বিধাহীন চিত্তে তাকে ছেড়ে দিত। আর অনায়াসে সে তার কাজ হাসিল করে বেড়াত। এই বামনটি নব্বই বৎসর বেঁচে ছিল বলে জানা গেছে।

বার্নামের নাম শুনেছেন বোধহয়। সার্কাস-পাগল এক বোহেমিয়ান। আমেরিকার লোক। দেশ-দেশান্তর থেকে জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত আকারের মানুষ সংগ্রহেরও বাতিক ছিল তাঁর। এই অদ্ভুত সংগ্রহের মধ্যে এক বিচিত্র মানুষ ছিল জেনারেল টম থাম। অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে-ছিল এই বামনটি। বার্নাম নিজেও গর্ব অনুভব করতেন এই অদ্ভুত আবিষ্কারের জন্যে। সার্কাসের ইতি-হাসে সে এক কিংবদন্তী। শুধু টমকে দেখার জন্যই বার্নামের তাঁবু জন-অরণ্য হয়ে উঠত। সত্যি-মিথ্যে জানি না টম কিন্তু বলে বেড়াত শুধু ইংল্যাণ্ডেই নাকি দশ লাখ মেয়ে তাকে চুম্বন করে ধন্য হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ সুন্দরীর চুম্বন-সুধাতেও সে তৃপ্তি পায়নি বোধহয়। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে সে বিয়ে করেছিল রাউডি ফ্রিডনিকে। আটাশ ইঞ্চি লম্বা এক বামনী। দীর্ঘ একুশ বছর তারা স্বচ্ছন্দে সংসার করেছিল। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিজপোর্টে টমের জন্ম। জন্মের সময় তার দেহ-সৌষ্ঠব ছিল একেবারেই অবিকল। সব কিছু ঠিকঠাক। কিন্তু পাঁচ মাস বয়স থেকেই তার গ্রোথ গেল থেমে। বয়স বাড়তে লাগল। কিন্তু টমের শরীরের দৈর্ঘ্য একুশ ইঞ্চি পার হতে পারল না।

বড় বড় হোটেলেও যে বামনরা জাঁকিয়ে বসে তার প্রমাণ আছে দেশেই। ভিয়েনার এক পাঁচতারা হোটেলের অ্যানাউন্সার ছিল আড়াই ফুট লম্বা এক বামন। রীতিমত স্মার্ট। ফিটফাট। হোটেলের ছিপছিপে সুন্দরী রিসেপসনিস্ট লয় দ্য ফি ঐ বামন বিলি কার্টিসের প্রেমে প্রায় ভেসে গিয়েছিলেন। শেষে তাঁরা বিয়েও করেন। লয়ের কত দৈর্ঘ্য জানেন? পুরো ছয় ফিট। ☐

হাবিব আহসান



পুজোর ছুটিতে





অফিসের কাজে রাজ্যটির রাজধানীতে বহুবার গিয়েছি। জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার সুযোগ পাইনি। অথচ পৌরাণিক পুরাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক খ্যাতি-সম্পন্ন জায়গা ও স্মারকগুলো প্রায় সবই গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে। অফিসের কাজে দু-চার-দিনের সফরে এসে যুগপৎ পর্যটক হওয়া সম্ভব নয়।

ঠিক করলাম, পুজোর অবকাশে নির্ভেজাল পর্যটক হিসেবে সপরিবারে ঐ রাজ্যটির দর্শনীয় ও সরকারি নথিভুক্ত আকর্ষণীয় জায়গাগুলোয় ঘুরে বেড়াব।

কোন অজানা জায়গায় পর্যটনে যাওয়ার আগে, বিশেষ করে ভিনরাজ্যে, কয়েকটা বিষয়ে কিছু তথ্য সঙ্গে থাকলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে অসুবিধেয় পড়তে হয় না। যেমন, কোন কোন জায়গায় যাব, কীভাবে যাব, কোথায় থাকব, কদিন লাগবে, আনুমানিক খরচ কত, এই সব। পরিবারের যাঁরা ভ্রমণ সঙ্গী বা সঙ্গিনী, তাঁদেরও তথ্যগুলো আগে-ভাগে জানিয়ে দেওয়া ভাল। অবশ্য জানিয়ে দেওয়ার পরেও যে সফরটা পুরোপুরি আনন্দ-মুখর হবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণরত এক মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের কথা মনে পড়ল। ট্যুরিস্ট বাসে চড়ে কাঞ্চিপুরম, পাক্ষতীর্থম ও মহাবলীপুরম সফর শেষ করে মাদ্রাজ ফিরছি। পরিবারটির কর্তা আমার পাশের সিটে। সামনের দুটো সিটে গিন্নি ও ছেলে। পাশের দুটো সিটে দুই মেয়ে। কর্তার বিরুদ্ধে চারজনেরই মিলিত অভিযোগ, একটানা মাদ্রাজি খাবার খেয়ে সবার পেটে চড়া পড়ে গেছে। ঢের বেড়ান হয়েছে। এবার তাদের ভালয় ভালয় বাড়িতে পৌঁছে দিলে সবার প্রাণগুলো কোন ক্রমে রক্ষে পায়। অ্যাদ্দিন মাছ মাংস না খেয়ে থাকা যায়?

কর্তার সঙ্গে আমার আগেই আলাপ হয়েছিল। পনের দিনের দক্ষিণ ভারত সফরের প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছেন। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। একে ক্রমাগত ট্রেন ও বাস জার্নির ধকল তার উপর খাওয়া থাকার ত্রুটি হওয়ার জন্যে পরিবারের সদস্য সদস্যাদের কাছ থেকে থেপে থেপে খোঁচা। ভদ্রলোক এক ফাঁকে আমাকে চুপি চুপি বললেন, দক্ষিণ ভারতে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আগে সবাইকে জানিয়েছিলাম। তখন সবাই এক-যোগে বলেছিল, বাইরে বেরিয়ে অত বাছ বিচার করলে চলে? যা পাওয়া যায়, তাই খাব। আর বড়া ইডলি দোসা? আমরা সবাই পছন্দ করি।

যে রাজ্যটিতে সপরিবারে পর্যটনে যাওয়ার মনস্থ করেছি, তার পর্যটন ও তথ্য দপ্তরের শাখা অফিস মধ্য কলকাতার পুরনো সাহেব পাড়ায়। রিসেপশন ও ইনফর্মেশন কাউণ্টার, কাঁচের দেওয়াল ঘেরা কেবিন, ফুল পাখি লতাপাতা খোদাই করা অফিস ঘরের পার্টিশন সব ঝকঝকে তকতকে। শুধু লোক নেই। হয়ত ক্ষণিক আগে সবাই ছিলেন। রূপকথার সেই দুষ্টু যাদুকরের মন্ত্রশক্তিতে অদৃশ্য হয়েছেন!

স্বাভাবিক কারণেই হতাশ হলাম। বেসরকারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কাজ করি। অফিস ছেড়ে আসা মানেই কাজ ফেলে আসা। কাউকে দেখতে না পেয়ে যখন দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, নারী ও পুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠের হাস্যরোল শুনতে পেলাম। আওয়াজটা এল অফিস ঘরের পার্টিশনের আড়াল থেকে। ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে দরজা পেরিয়ে নিচে নেমে গেল। পার্টিশনের ভিতর থেকে এবার বয়স্কা নারীকণ্ঠের আওয়াজ। রাজভোগ, কাঁচাগোল্লা, ল্যাংচা, যা পাস, তাই আনস। বুঝছস? উ! ছোঁড়াটারে লইয়া পারি না। না বোঝে বাংলা, না বোঝে হিন্দি!

কী চাই? কাউণ্টারে ওয়েট করেন এখানে আসছেন ক্যান ভিজিটারসদের ভিতরে আসা নিষেধ। নোটিশ বোর্ড দ্যাখেন নাই?

পার্টিশনের আড়ালে বসান অফিস ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। একই নারী কণ্ঠের অধিকারিণীর নির্দেশ অনুসারে বাইরে বেরিয়ে এসে ইনফর্মেশন কাউণ্টারে দাঁড়ালাম।

একজনের আসার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। স্বভাবতই তাঁর যেদিক থেকে আসার সম্ভাবনা, সেই কাঠের পার্টিশনের দিকে আমার চোখ কান পড়ে রইল।

হাঁ! তরে যা কইতাছিলাম। আমার হাজব্যাণ্ডের ফ্যামিলিতে সবাই ছয় ফুটের উপর। আমি হইলাম গিয়া চার দশ। বিয়া আটকাইসে? তুই তো জানস, আমাগো লাভ ম্যারিজ। এক-বারটি কাউণ্টার থেইক্যা ঘুইরা আয়। ভিজিটার কী চায় দ্যাখ। যত সব।

পার্টিশনের আড়াল থেকে একটি তরুণী বেরিয়ে এসে বললেন, বলুন কী চাই?

বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আপনা-দের রাজ্যে পর্যটনের বিষয়ে কিছু খবর নিতে বসেছি।

হেসে বললেন, আমি ঐ রাজ্যের মানুষ নই। কলকাতার। এখানে শুধু কাজ করি। যা হোক আজ কিছু পাচ্ছেন না। আমাদের অফিসে বিশেষ কারণে আজ হাফ হলিডে। আমরা একটু পরেই চলে যাচ্ছি।

যদি কোন প্যাম্ফলেট বা লিটারেচার থাকে। ওতেই আমার কাজ চলে যাবে। নাছোড়বান্দা হয়ে বললাম।

ওসব কিছু নেই। অন্য কোন খবর চান তো কাল আসবেন। অফিস ক্লোজড। ও-কে? বেয়ারা-গোছের সেই তরুণটি এর মধ্যে মিষ্টির ঠোঙা হাতে অফিসে ঢুকতে ভদ্রমহিলা আর কোন কথা না বলে তার সঙ্গে পার্টিশনের আড়ালে অদৃশ্য হলেন।

পুজোর অবকাশে সে বছর আর সপরিবারে ঐ রাজ্যে পর্যটনে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে অফিসের কাজেই পুজোর পর ঐ রাজ্যের রাজধানীতে গিয়ে-ছিলাম। এক বেসরকারি নৈশ-ভোজে আমন্ত্রিত কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ঐ রাজ্যের পর্যটন ও তথ্য দপ্তরের অধিকর্তাও ছিলেন। ব্যবসায়িক যোগসূত্রে আমিও ছিলাম আমন্ত্রিত-দের একজন। তাই ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। প্রাণবন্ত হাসিখুশি দিলদরিয়া পুরুষ। লৌকিক নৈশভোজের প্রথম পর্বে শিষ্টাচার অনুযায়ী এক-জনের পাশে বেশি সময় বসা সৌজন্যের বাইরে। ঘুরে ফিরে সবার সঙ্গে হ্যালো হ্যালো ও করমর্দন করে আলাপ করতে হয়। কিন্তু আমার হল মুস্কিল। ভদ্রলোক আমাকে ছাড়তে চান না। কথা প্রসঙ্গে পরের দিন ওঁর অফিসে যাওয়ার আমন্ত্রণ করে বললেন, পর্যটনের উপর আপনাকে খান-কয়েক ভাল লিটারেচার দেব।

পরের দিন ওঁর অফিস থেকে রং-বেরংয়ের কয়েকটি পুস্তিকা নেওয়ার সময় বলেছিলাম, এগুলো আপনাদের শাখা অফিসে পাঠান হয় না?

টেবিল চাপড়ে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, আরে মশায়! পোকায় খাচ্ছে। দশ বছরেও এগুলোর স্টক কমেনি। ব্রাঞ্চ অফিস থেকে যদি রিকুইজিশন না পাঠায় করবটা কী? দশ বছরের মধ্যে দু-একটা সাদা কাগজের হ্যাণ্ডবিল ছাড়া আর কোন লিটারেচার ছাপা হয়নি। যেগুলো আপনাকে দিলাম, দশ বছর আগেকার ছাপা।

কিন্তু এভাবে আপনাদের পর্যটন দপ্তরের নিশ্চয়ই বেশ ক্ষতি হচ্ছে....।

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, আরে মশায়! ক্ষতির কথাই যখন তুললেন, তাহলে বলি। অবশ্য বিটুইন ইউ অ্যাণ্ড মি। দেশি বিদেশি পর্যটকদের আমাদের রাজ্যে বেড়ানর সুযোগ সুবিধে করে দেওয়া ছাড়াও পর্যটন ব্যবসা সরকারের একটা ভাল আয়ের পথ। এ নিয়ে ভাবছেটা কে? লাখ লাখ টাকা খরচে তৈরি এতগুলো ট্যুরিস্ট বাংলো প্রায় সারা বছর ধরে ফাঁকা। বেয়ারা, বাবুর্চি, মালী, কেয়ারটেকার সব বসে বসে বেতন পাচ্ছে। ওরা করবেটা কী? কাজ দিলেই কাজ করবে। কিন্তু ভিজিটারস কই?

বেয়ারাকে চায়ের অর্ডার দিয়ে বললেন, আপনি তো কলকাতার অনেকগুলো পত্রিকায় লেখেন। আমাদের রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের কোন বিজ্ঞাপন আজ পর্যন্ত আপনার চোখে পড়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, না।

তাহলেই ব্যাপারটা বুঝুন। লোককে না জানালে, লোকে জানবে কী করে? এই কাজের দায়িত্বটা কিন্তু স্থানীয় প্রতিনিধিদের। তাঁরা সুপারিশ করে চিঠি দিলে, তবেই আমি বিজ্ঞাপন ছাড়ার অনুমতি দিতে পারি। এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন চিঠি আমার কাছে পৌঁছয়নি।

এরকম দু-একটা রাজ্যের পর্যটন বিভাগের ছবি দেখে আঁতকে উঠে ভ্রমণ সূচি বাতিল না করাই ভাল। কেন্দ্র শাসিত এলাকা নিয়ে একত্রিশটি রাজ্য মিলে ভারত এক বিশাল দেশ। কলকাতায় বা অন্য বড় শহরে অবশ্য সব রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের শাখা অফিস নেই। যেগুলোর আছে, তার মধ্যে কয়েকটি অফিসে দেখা যাবে যুগপৎ আতিথেয়তা ও আন্তরিকতার ডালি সাজিয়ে বসে আছেন অফিসের সবাই। লিটারেচার, প্যাম্ফলেট ও ম্যাপ দিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হন না। হাসি মুখে বলেন, কোথায় যাবেন? আইডিয়া পেলে একটু ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি।

পর্যটকের আনন্দ পর্যটনে। উদ্যোগটাও একান্ত নিজস্ব। কোন রাজ্যের পর্যটন বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত বা পর্যটকদের আকর্ষণ করার ব্যাপারে উদাসীন, এসব চিন্তায় নিজেকে ভারাক্রান্ত না করে নিজের থেকেই যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে বেরিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

পর্যটনের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্যে কলকাতা ও প্রায় সব বড় শহরেই ছড়িয়ে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন দপ্তরের অফিস, কলকাতার অফিস, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের কাছে জওহরলাল নেহেরু রোড থেকে শেক্সপিয়র সরণী ধরে কিছুটা এগোলেই ডান দিকে। পূর্ব সীমান্তের মণিপুর নাগাল্যাণ্ড থেকে পশ্চিমের গুজরাট মহারাষ্ট্র অথবা উত্তরের কাশ্মীর হিমাচলপ্রদেশ থেকে দক্ষিণের তামিলনাড়ু কেরালা পর্যন্ত যে জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে। শুধু নাম বললেই হল। সঙ্গে সঙ্গে পর্যটন বিষয়ে পুস্তিকা হাতে এসে যাবে। অবশ্য সব সময় সব জায়গার পুস্তিকার স্টক নাও থাকতে পারে। তবে এ ব্যাপারে কর্মীরা তাঁদের সাধ্যমত নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

সরকারি পর্যটন দপ্তর থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ না করে অপরিকল্পিত সফরে বেরিয়ে বহু ক্ষেত্রেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে রিক্সা, টাঙ্গা, ট্যাক্সি, হোটেল ও সেলফ-স্টাইলড ট্যুরিস্ট গাইডদের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। অথচ অনেকেরই সরকারি পর্যটন অফিস সম্বন্ধে অহেতুক ভয়। নিউ মার্কেটে যেমন সব সময় সব জিনিসের দাম বেশি নয়, সরকারি পর্যটন অফিসগুলোর ভ্রমণসূচি সেই রকম সব ক্ষেত্রে যে দামী হবে, তার কোন মানে নেই। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত চারতারা পাঁচতারা হোটেল, ট্রেন, বাস ও বিমানের খুঁটিনাটি খবর যেমন পাওয়া যায়। তেমনি দ্বিতীয় শ্রেণীর জনতা ট্রেন, সাধারণ বাস, কম খরচের হোটেল, ইয়ুথ হোস্টেল, ডরমিটরি ও গুজরাটি মারোয়াড়ী ধর্মশালা বা নানারকম সেবা প্রতিষ্ঠানের অতিথিশালার বিস্তারিত বিবরণ পেতেও অসুবিধে হয় না।

পর্যটনের জন্যে ভারতে হাজার হাজার বেসরকারি সংস্থা গড়ে উঠেছে। নয়া দিল্লি স্টেশনের সামনে পাহাড়গঞ্জ এলাকা, হায়দ্রাবাদের নামপল্লী ও লকড়িকাপুল এলাকা ও বাঙালোরের সরকারি বাস স্ট্যাণ্ড ও সিটি রেলওয়ে স্টেশনের লাগোয়া এলাকা জুড়ে পুরো, অর্ধেক বা সিকি ঘরের মধ্যে অসংখ্য পর্যটন সংস্থার সাইন বোর্ড দেখলে সারা ভারতে এরকম সংস্থার সংখ্যা আনুমানিক কত হতে পারে, কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের চটক ও দালালদের হাঁকডাকে অনেক সময় ভুয়া সংস্থার খপ্পরে পড়ে সাধারণ পর্যটক প্রবঞ্চিত হন। এর মধ্যেই বেশ কিছু ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বেসরকারি সংস্থা বহু বছর ধরে পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের সততা ও যত্নের সঙ্গে পর্যটনে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানেও মুস্কিল। অতি পরিচিত ও চালু সংস্থাগুলোর নামে বা নামের কিছুটা অদলবদল করে বহু সংস্থা গজিয়ে ওঠায় বোঝা কঠিন, কোনটা আসল ও কোনটা নকল।

কলকাতা শহরে এরকম বহু নকল সংস্থা যখন তখন গড়ে ওঠে এবং উঠে যায়। এইসব সংস্থা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পর্যটনবিলাসী লোকদের আকর্ষণীয় ভ্রমণসূচি দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে টাকা পকেটে নিয়ে টিকিট ধরিয়ে দেয়। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে দেখলেন, বাস তো দূরের কথা, সংস্থার লোকজনেরও হদিস মেলে না। কণ্ডাকটেড ট্যুরটা বাসে হলে, তবু ধর্মতলার আশেপাশের কোন জায়গা থেকে বাড়ি ফিরে আসা যায়। ট্রেনের টিকিট হলে, হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম বা নির্দিষ্ট ট্রেনের গায়ে লাগান সংরক্ষণ তালিকায় নাম দেখতে না পেয়ে কুলি ও ট্যাক্সিকে ডবল দক্ষিণা দিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। ঘটনাটা যদি ঘটে পুজো অবকাশের সফরে, বাক্সপ্যাঁটরা বাড়িতে রেখে পাড়ার পুজো মণ্ডপে ষষ্ঠীর বোধন দেখা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

টিকিটটা নিজে সংগ্রহ করতে পারলে সবচেয়ে ভাল। যদিও আজকের দিনে বহু মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। অসংখ্য পর্যটন সংস্থার প্রতিনিধিও টিকিটের কালোবাজারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পেরে ওঠেন না। যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা নিতান্ত অনন্যোপায় না হলে রেল টিকিট সংরক্ষণ অফিসারের ত্রিসীমানায় যান না। জানাশোনা অথবা সরকারি অনুমোদিত ট্র্যাভেল এজেন্টদের কাছ থেকে টিকিট-প্রতি বার থেকে চব্বিশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে ট্রেনে আসন সংরক্ষণ করেন। যাত্রার তারিখ ও কটা আসন চাই জানিয়ে দিলে হল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই টিকিট হাতে পেয়ে যান।

পর্যটনের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে টিকিট পকেটে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পথের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পর্যটকেরও কম নয়। শান্তি রক্ষা বলতে রেলডাকাত ছাড়া আর সব সহযাত্রী ও রেলকর্মীদের সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টার সহাবস্থান, ট্রেনের মধ্যে ভিনরাজ্যের মানুষদের সম্বন্ধে বিরূপ আলোচনা ও মন্তব্য থেকে বিরত থাকা।

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। কার্য-সূত্রে ট্রেনে চড়ে যাচ্ছি এক প্রতিবেশী রাজ্যের উপর দিয়ে। গন্তব্যস্থল, ঐ রাজ্যটির রাজধানী।

কোচ অ্যাটেণ্ড্যান্টের ডাকে ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেল। পরের স্টেশনে নামতে হবে। তাই তৈরি হওয়ার জন্যে এই ওয়েক কল। ট্রেনটা একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে।

ঘুম ভাঙলেও বার্থ ছেড়ে তখনও নিচে নামিনি। ভাবলাম, ট্রেনটা ঐ স্টেশন ছাড়লেই সুটকেশ ও ব্যাগ গোছান শুরু করব। আরও কয়েক মিনিট গড়িয়ে নিলে মন্দ হয় না।

দশ মিনিট দাঁড়ানর কথা। কিন্তু আধঘণ্টা হয়ে গেল ট্রেন ছাড়ার নামগন্ধ নেই। আমার কমপার্টমেন্টের আর এক যাত্রীরও একই গন্তব্যস্থল। উনি এর মধ্যে প্রাতঃকৃত্য সেরে পোশাক পাল্টে তৈরি হয়ে বসেছিলেন। ট্রেন ছাড়তে দেরি দেখে হয়ত কারণটা জানার জন্যেই করিডোরের দিকে গেলেন।

মুহূর্তের মধ্যে এক লাফে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে

বললেন, মশায়! কেলেঙ্কারি ব্যাপার। পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষে পেলে হয়। খবরদার! জানালার শাটারটা ভুল করেও তুলবেন না।

ওঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় লাথি ও জানালার বাইরের দিকে টিনের শাটারে পাথর বৃষ্টির শব্দ। তার সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে বঙ্গভাষীদের উদ্দেশ্যে গালি-গালাজ।

এইভাবে গালিগালাজের ঝড় ও দরজা জানালার উপর লাথি ও পাথর বৃষ্টি কয়েক মিনিট ধরে চলার পর যেন হঠাৎ দুর্যোগটা কেটে গেল। প্রথম শ্রেণীর ঐ কুপের আমরা দুজন যাত্রী একই বার্থের দুদিকে পদ্মাসনে বসে তখনও নিজ নিজ ইষ্টদেবতাদের স্মরণ করছি। ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করার পর কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ব্যাপারটা শুনলাম। এক বিরাট পর্যটক দলের কয়েকজন যুবক-যুবতী হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা তামাশা ও হৈহুল্লোড় শুরু করেন। উদ্দেশ্য, সফরটিকে আনন্দমুখর ও প্রাণবন্ত করে তোলা।

উদ্দেশ্যটা খারাপ ছিল না। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই সীমা থাকা দরকার। দ্বিতীয় শ্রেণীর অত বড় সংরক্ষিত কামরায় আরও বহু যাত্রী যাচ্ছেন, যাঁরা একটা সময়-সীমার পর বিশ্রাম করতে চান। বহু কষ্টে সংরক্ষিত আসন জোগাড় করে, সারারাত জেগে অন্যের হাসিঠাট্টা শোনার মত ধৈর্য সবার নাও থাকতে পারে। তবুও কেউ আপত্তি করেননি। কারণ যুবক-যুবতীদের দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ট্রেনটি ওঁদের স্বরাজ্যের সীমানা পেরিয়ে প্রতিবেশী রাজ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যুবক-যুবতীদের হাসিঠাট্টার বিষয়বস্তু হল, দ্বিতীয় রাজ্যটির অধিবাসীদের ভাষা, জীবনযাত্রা, কবিতা, গান, ডাক্তারি, ওকালতি, অধ্যাপনা, এই সব। কিছু অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ কূপমণ্ডুকের বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁদের এই ব্যঙ্গ নাটিকার অবতারণা। প্রায় সবটাই কাল্পনিক।

দ্বিতীয় শ্রেণীর এই থ্রি-টায়ার কম্পার্টমেণ্টের সবচেয়ে উপরের দুটি বার্থে দ্বিতীয় রাজ্যটির দুই যুবক সারারাত ধৈর্য ধরে ঐ সব ব্যঙ্গোক্তি শুনেও প্রতিবাদ করেননি। তাঁদের গন্তব্যস্থলে ট্রেনটি পৌঁছতে প্ল্যাটফর্মে নেমে স্বরাজ্যের রেল-কর্মী, কুলি ও আরও কিছু স্থানীয় যুবকদের কাছে ঘটনাটির বিবরণ দেন।

আমার স্বরাজ্যের ঐ পর্যটক দলের কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী ও প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের তাঁদের মধ্যেই কিছু সহযাত্রী ও সহযাত্রিণীর কুকর্মের ফলে কী দুর্দশা হয়েছিল, এত বছর পরেও সেই নিদারুণ ও মর্মান্তিক ঘটনা মনে থাকলেও তার বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক।

তাই পর্যটনে বেরিয়ে ভিন রাজ্যের মানুষদের খাদ্য, ভাষা, পোশাক, চালচলন ও সামাজিক নিয়মের উপর কটাক্ষ করে কথা বললে ও চারণ কবির সুরে স্বভাষীদের শিক্ষা সভ্যতা ও জীবনযাত্রার মানকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে জাহির করলে ঐভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, নজরুল ইসলাম প্রমুখ মনীষীদের ভিন রাজ্যের শিক্ষিত মানুষরা চেনেন ও শ্রদ্ধা করেন। তাই পর্যটনে বেরিয়ে কথায় কথায় এই সব মনীষীদের নাম উল্লেখ করে ভিন রাজ্যের মানুষদের কাছে বঙ্গ সংস্কৃতির পরিচয় না দেওয়াই ভাল। তাঁরা শুনতে চান নতুন কিছু। আর বঙ্গ সংস্কৃতির পরিচয় পাবেন বঙ্গভাষী পর্যটকদের ব্যবহার ও কথাবার্তার মাধ্যমে। তাঁরাও শোনাতে চান তাঁদের গল্প, প্রাচীন ঐতিহ্য ও শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ।

ভিন রাজ্যে পর্যটনে বেরিয়ে মহাবলীপুরমের সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে বঙ্গোপসাগরে সূর্যোদয় ও মুরুদজঞ্জিরার শোর কটেজে বসে আরব সাগরে সূর্যাস্ত অথবা পূর্ণিমার রাতে তাজমহল ও অমাবস্যার রাতে বিবেকানন্দ শিলায় বসে ভারত মহাসাগরের সৌন্দর্য উপভোগ করে আমাদের দেশের বৈচিত্র্যময় রূপের হয়ত কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দেশের নানাপ্রান্তে ছড়ান মানুষ? তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান হলে তবেই ভিন রাজ্যে পর্যটনটি হবে সব দিক দিয়ে সার্থক ও আনন্দমুখর। □

মুক্তিপদ চৌধুরী

যাযাবরের ঘর

যাযাবররা ঘর বাঁধছে। শুনলে খুবই অবাক লাগে। কিন্তু এক দল যাযাবর শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বেশ কিছু কলোনি করে বসবাস শুরু করেছে। যাযাবরের জীবন থেকে এই স্থায়ী জীবন কেন তারা বেছে নিল? এর পশ্চাতে কী গূঢ় রহস্য আছে, তাই নিয়ে এই প্রতিবেদন।

গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি আর এড়ান গেল না। অনেক ফন্দি ফিকির করে গোপন আস্তানায় আত্মগোপন করবে, ঠিক সেই মুহূর্তে সুধন ধরা পড়ল। হাতের স্যুটকেস খুলে পুলিশের চোখ ছানাবড়া। তাতে বে-আইনি ভাঙ-গাঁজা, সোনা জহরৎ অথবা হীরে মুক্তা নয়, কিছু সাধারণ জামাকাপড়ের ভাঁজে জড়ান স্রেফ একটি এম এম-৯ পিস্তল। আর বেশ কিছু তরতাজা কার্তুজ। পিস্তলটির দাম কম করেও বিশ হাজার টাকা।

কোথায় কীভাবে সুধন এই সুটকেসটি গায়েব করেছে, পুলিশ তার বিবরণ জেনে নিল। পুলিশের চোখে তখন আর এক নতুন ইশারা। ভাবল ঐ স্যুটকেসের সূত্র ধরে নতুন কোন অজানা রাজনীতির উৎস সন্ধানে এগোবে। তাদের ধারণা হল, আসাম, উত্তর বাংলা আর পার্বত্য অঞ্চলের কোন বৈরী বিপ্লবীদের গোপন সূত্র এই স্যুটকেসেই মিলবে।

এমনি অজস্র ছোট বড় চুরি-ছিনতাইয়ের প্রাথমিক ঘটনা শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুধনদের সম্পর্কে থানা-পুলিশের সার্টিফিকেটের অভাব নেই। ওরা নিরীহ। স্থানীয় অঞ্চলে চুরি-ছিনতাই রাহাজানি করে না। বরং আশেপাশের লোকের আপদে বিপদে এগিয়ে যায়, সাহায্য-সহায়তার হাত বাড়ায়।

কে এই সুধন? কী ওদের পরিচয়? এই খোঁজখবর নিতে গিয়ে হাজির হলাম শিলিগুড়ি থেকে বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। জলপাইগুড়িমুখী সড়ক পথ ধরে এগোলেই রাজগঞ্জ। এই থানার অধীন কাঁটাপুকুর। পাকা পথের পাশে জলপাইগুড়ি – শিলিগুড়ির সীমানা বরাবর এই



যাযাবর মা আর ছেলেমেয়ে

কাঁটাপুকুর এখন 'ইরানি কলোনি' নামে খ্যাত। ইরানি কলোনি বা বস্তিতে কয়েকশ পরিবারের বসবাস। এই বস্তিতে যত না পুরুষ, তার চেয়ে অনেক বেশি মেয়ে। আর যত না মেয়ে—তার চেয়েও অনেক গুণ বেশি বাচ্চা। স্থানীয় লোকের ভাষায় এরা 'ইরানি জিপসি।' অর্থাৎ ইরান থেকে আসা যাযাবর। পুলিশের খাতায়ও এরা ইরানি জিপসি বলে বিবেচিত। কিন্তু আসল পরিচয় বোধহয় ভিন্ন।

যতদূর জানা গেল, তথাকথিত ইরানি কলোনির ইরানিরা আসলে ইরানি নয়। ভারতীয় যাযাবর। এদের আদিবাস রাজস্থানের থর মরু-অঞ্চলে। অজানা অতীতে থর মরুভূমিতে একদা বালিয়াড়ি ঝড়ে নিদারুণ বিপর্যয় নেমে আসে। ওদের সমাজ-জীবন হয় বিপর্যস্ত। মরু মানচিত্রেও দেখা দেয় অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। তারপর থেকেই থর মরু অঞ্চলের বাসিন্দারা ঘরছাড়া, ছিন্নমূল। পথে পথে ঘুরে ওরা কোনরকমে জীবন বাঁচায়—ধ্বংসের হাত থেকে বংশ রক্ষায় সচেষ্ট হয়। পথ হয় ঘর। এভাবেই ওদের যাযাবর জীবনের সূচনা। এরা সকলেই হিন্দু সম্প্রদায়ের গোয়ালা। এই হল সুধনদের আসল পরিচয়।

রাজগঞ্জ থানার পুলিশ অফিসার পরিতোষ চক্রবর্তীর ভাষায় ওরা 'কারোয়ান নাট'— ওদের বেশির ভাগই ক্রিমিন্যাল। এদের জীবিকা হাতসাফাই, চুরি, রাহাজানি। শতকরা নব্বইভাগই নানা অসামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত। স্থানীয় এলাকায় এরা নিরীহ গো-বেচারা। কোনরকম অন্যায় বা বেআইনি কাজে যায় না। সর্বভারতীয় স্তরে বড় বড় শহরে এদের 'বেওসা।' বিশেষ করে দিল্লি-বোম্বে-মাদ্রাজ-কলকাতা শহর এদের জীবিকার অন্যতম আশ্রয়স্থল। এরা এই 'বেওসা'-কে নিজেদের জাত-ব্যবসা বলে মনে করে। এর মধ্যে কোন অপরাধ আছে বলে এরা বিশ্বাস করে না। ওদের পরিভাষায় এই বেওসার পরিচয় 'আঁখ বন্ধ ডিব্বাখালি'—অর্থাৎ চোখ বন্ধ করলেই ডিব্বা বা ব্যাগ হাওয়া।

জনৈক থানা অফিসার জানালেন, দিল্লি দিল্লি চষে খেলেও, স্থানীয়ভাবে এরা পুলিশের কাছে কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। ধর্মকর্মেও মন আছে। হাতে বেশ পয়সা-কড়ি। বেশি দামে জমি কিনে পাকাপোক্ত বাড়িঘর তৈরি করেছে। হাটে-



এসে পৌঁছেছে! ভারতের সর্বপ্রথম
'ময়েশ্চার ব্যালেন্সড্' সাবান।
ক্লীয়ার·টোন
ত্বক-পরিচর্যাকারী সাবান।
ত্বককে পরিষ্কার করে, অথচ শুকিয়ে দেয় না,
কোমল-মসৃণ রাখে, অথচ তেলতেলে করে না!
এক বিশেষ
ফ্রেঞ্চ
সুবাস!
Clear·tone
skin care
soap
Cleartone
ক্লীয়ার·টোন সাবানে থাকে নানান অনন্য সেই সব উপাদান—যা আপনার ত্বকের গভীর পর্যন্ত ঢুকে সাফ করা আর ত্বককে কোমল-মসৃণ ক'রে তোলার জন্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুষম। ক্লীয়ার·টোন সাবানের এই বিখ্যাত ময়েশ্চারাইজার, অপরিহার্য তরল পদার্থের সাহায্যে একদিকে যেমন আপনার ত্বকে যোগায় পুষ্টি—অপরদিকে তেমনি এর রাশিরাশি ফেনা ত্বককে করে তকতকে পরিষ্কার ও অতি মোলায়েম। ক্লীয়ার·টোন স্নানে পাবেন তৃপ্তি... আপনার ত্বকটি শুকনো বা তেলতেলে না হয়ে পাবে শিশির-স্নিগ্ধ ও নমনীয়তা মেশানো দীপ্তি! তাছাড়া, ক্লীয়ার·টোন সাবানে থাকে বহুক্ষণ রেশ টেনে রাখা এক অপরূপ ফ্রেঞ্চ সুবাস! ক্লীয়ার·টোন সাবান—আপনার ত্বককে করে আরো সতেজ, আরো সুকোমল, আরো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল!
ক্লীয়ার·টোন
ত্বক-পরিচর্যাকারী সাবান।
লণ্ডন · প্যারীস · নিউ ইয়র্ক



আজ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে
রঙ ফর্সা করার ক্রীম
ক্লীয়ার·টোন
আপনাকে দেবে—এক নতুন রূপ!
১ম সপ্তাহ
Cleartone
মাত্র তিন দিনেই আমার চামড়া নরম!
২য় সপ্তাহ
আমার ব্রণর দাগগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। আরাম!
৩য় সপ্তাহ
দেখুন! ইতিমধ্যেই আমার খরখরে কনুইও কেমন মোলায়েম!
৪র্থ সপ্তাহ
আমার বান্ধবী বললো, "তোর রঙে জৌলুস দেখা দিয়েছে রে!"
৫ম সপ্তাহ
আশ্চর্য্য! রোদ্দুরে ঘুরেও আমি কালো হচ্ছি না!
৬ষ্ঠ সপ্তাহ
আমি এখন একজন ক্লীয়ার·টোন ক্রীম ফ্যান!
ক্লীয়ার·টোনের অদ্বিতীয় ফরমূলা মৃদু আর স্বাভাবিকভাবে আপনার ত্বক আরো উজ্জ্বল, আরো ফর্সা ক'রে তোলে। শুধু তাই নয়। ক্লীয়ার·টোনের এক অনন্য উপাদান ত্বকের কুৎসিৎ দাগ আর খুঁত দূর ক'রে দেয়। এর সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার ৬ সপ্তাহের মধ্যেই আপনার রঙরূপ এমন উজ্জ্বল আর কোমল ক'রে তোলে, যা নজরে পড়ে। নিয়মিত রোজ দুবার ক'রে ক্লীয়ার·টোন মাখতে থাকুন—তাহলে কি রোদে কি ঘরে, এর সুফল বজায় থাকবে চিরতরে!
Clear·tone
the perfect fairness cream
ক্লীয়ার·টোন
লণ্ডন · প্যারীস · নিউ ইয়র্ক
daCunha/CLS/14/85/BEN


শুক্রবার
মন ঠিক করে নিন:
১৫
মনে করুন, টেস্ট ম্যাচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনটির একটি
টিকিট আপনি যোগাড় করেছেন। হঠাৎ দেখলেন যে আপনার
একটা জরুরী মিটিং পড়ে গেছে। আপনি কি
১/ চেষ্টা চরিত্র করে বিকেলের পর মিটিংয়ের ব্যবস্থা করাবেন?
২/ কোন অজুহাত দেখিয়ে অফিস থেকে কেটে পড়বেন?
৩/ টিকিটটা অন্য কাউকে দিয়ে দেবেন?
৪/ টিকিট নিজের কাছেই রেখে দেবেন, যদি সুযোগ করে... ?
যাঁরা সঠিক সিদ্ধান্ত নেন তাঁদেরই জন্যে
WILLS FLAKE
FILTER KINGS
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
উইল্‌স ফ্লেক কিংস
কিং সাইজের যে স্বাদ শুধু উইল্‌সই পারে দিতে
এবার নিন আজকের দিনের আকর্ষণীয় 20-র প্যাকেটে
বিধিসম্মত সতর্কীকরণ সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর
STATUTORY WARNING CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
WFK-5480R

বাজারে এদের সবসময়ই কড়কড়ে একশ টাকার নোট ভাঙাতে দেখা যায়।

পুরুষ যখন বড় বড় শহরে হাতসাফাই করে, মেয়েরা কিন্তু তখন ঘরে বসে অলস সময় কাটায় না। এদের মধ্যে যারা একটু নীচুতলার তাদের ঘরের মেয়েরা কোলে, কাঁখে বাচ্চা নিয়ে আশেপাশের শহর এলাকায় যায়। সেখানে নানা ধান্ধায় ঘোরে। পুলিশের খাতায় এমন বিবরণও আছে যে, এইসব মেয়েরা সঙ্গে এক ধরনের সাদা পাউডার রাখে। স্টেশনে বাজারে কারোর হাতে দামী কিছু দেখলে এরা তাকে অনুসরণ করে। তারপর সময় সুযোগ বুঝে সংশ্লিষ্ট মানুষটির পাশ দিয়ে হাঁটার সময় সামান্য সেই গুঁড়া পাউডার তার ঘাড়ে বা হাতে ছুঁড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শুরু হয় চুলকানি। যত সময় যায়, চুলকানিও ততই বাড়ে। অসহ্য চুলকানিতে হাতের মাল রেখে যখন সে একটু অন্যমনস্ক হয়, তখন তা নিয়ে ঐ মেয়েরা বেপাত্তা হয়। জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানায় অতি সম্প্রতি একটি এ ধরনের চুরি ধরা পড়েছে।

এদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর মেয়ে আছে, যারা বাচ্চা কোলে নিয়ে শহরের হাটে-বাজারে ঘোরে এবং চুরির ধান্ধায় থাকে। মনে রাখা প্রয়োজন কোলের বাচ্চাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের নয়—বস্তি থেকে ধার করে নেওয়া। বাজারে গিয়ে হাত-সাফাই করার সময় যদি সে ধরা পড়ে, তখন সে মারের হাত থেকে বাঁচার জন্য কোলের বাচ্চাটিকে ব্যবহার করে। চুরি করে ধরা পড়লে সে চিমটি কেটে কোলের বাচ্চাকে কাঁদায়। এভাবে তার উপর যতই লোক চড়াও হয়, সেও বাচ্চাটিকে তত বেশি করে কাঁদানর চেষ্টা করে। অতঃপর মানবিকতার কারণে সাধারণ মানুষ এই ইরানি 'বেওসায়িনীদের' ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ইরানি বস্তিতে ঢুকতে একদল যাযাবর আমাদের ঘিরে ফেলল। ঘেরাওকারীদের অধিকাংশই তরুণী মহিলা। সন্দেহ-সংশয় চোখে হিন্দি বাংলায় মেশান নানা প্রশ্ন। লক্ষ্য করলাম, ঘাগরা পরা তরুণী ইরানি মেয়েদের চপল-চতুর চাহনির মাঝে চওড়া লালপাড়ের শাড়ি পরা এক প্রবীণা—চোখে মুখে স্নেহময় হাসি। তাঁর পরিচয় মহারানী। মহারানী এই বস্তিতে প্রতিষ্ঠিত কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের দেখাশুনা করেন। ইনি সর্বজন শ্রদ্ধেয়া। সকলেই এঁর নির্দেশ একবাক্যে মেনে নেয়।

স্বল্পবাক মহারানী এগিয়ে এসে দেবীর প্রসাদ দিলেন। আমরা কামাখ্যা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানাতেই তরুণী মেয়েরা বিস্মিত। তাদের দেবী-মন্দিরের প্রতি আমাদের ভক্তি দেখে বোধহয় আমাদের প্রতি খানিকটা শ্রদ্ধাভাব জাগল। এবার একে একে এরা মুখর হল।

সুদর্শনা সরোজিনী হেসে জানাল, মাত্র এক বছর হল তার শাদি হয়েছে। কর্তা বেওসার কাজে বাইরে। কবে আসবে, তা জিগ্যেস করা বারণ। চিন্মো এগিয়ে এল। তাকে দেখে মনেই হবে না সে সাত ছেলেমেয়ের মা। হাসিখুশি এই তরুণী প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। সে প্রশ্ন করে জানতে চাইল, আমার শাদি হয়েছে কিনা।

শ্যামার সন্তান সংখ্যা সাত। ওর বয়স বড়জোর ত্রিশ। কিন্তু স্বাস্থ্যের বাঁধন অটুট। বয়সের চিহ্ন নেই ওর চোখেমুখে। একটু বাচাল। হরিণীর মত চঞ্চলা—একে একে সাত ছেলেমেয়েকে ডেকে আনল। বলল, দেখ—এরা আমার আদরের বাচ্চা।

মহারানী পাশে দাঁড়িয়েই হাসছিলেন। জানালেন, তিনি ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন। কামাখ্যা দেবীর নিত্যপূজার আয়োজন করেন। ভিন গাঁ থেকে এক ব্রাহ্মণ আসেন। পাকা-মন্দিরের সামনে বিরাট চাতাল। কলোনির বাসিন্দারা দেখলাম কামাখ্যা দেবীর দারুণ ভক্ত। ওরা বেওসা যাত্রার আগে কামাখ্যা দেবীর আশীর্বাদ কামনা করে বাইরে যায়। ওদের বিশ্বাস, হাত সাফাই-এর জাদুতে কামাখ্যা দেবীর আশীর্বাদ অবশ্য প্রয়োজন।

মহারানী জানালেন, দুর্গাপূজায় এই কলোনিতে খুব আনন্দ হয়। দু খানা পূজা হয়। বহু টাকা চাঁদ ওঠে। এদের অন্য পূজ্য দেবদেবী মা কালী, মালা লছমন, মা মহারানী এবং গ্রাম ঠাকুর (এর মূর্তি নেই)। মহারানীর ঘরের পাশে অন্য একটি ঘরে দেখলাম 'গোর-নেতাই' প্রতিষ্ঠিত।

জানা গেল, মহারানী বিশেষ বিশেষ দিনে 'ভর' পড়েন। পাঁচ গাঁয়ের মানুষ আসে। 'ভর-পড়া' অবস্থায় তিনি নানা ওষুধ দেন। তাতেই তাদের রোগ মুক্তি ঘটে বলে বিশ্বাস।

ইরানি এই বস্তির কোনও তরুণ তরুণীর বাইরে শাদি করা বারণ। প্রেমপ্রীতি ভালবাসা আর রাগ-অনুরাগ এই বস্তির মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন তরুণ-তরুণীর প্রেম যদি গভীর হয়, তবে তা পঞ্চায়েত যাচাই করবে। বিয়ে শাদির ব্যবস্থাও পঞ্চায়েতের হাতে। পঞ্চায়েতই এই কলোনির আসল মালিক। প্রবীণদের নিয়ে পঞ্চায়েত সভা হয়। তবে পঞ্চায়েতের সদস্যদের অধিকাংশই মেয়ে। তার শীর্ষে থাকে মুখিয়া—অর্থাৎ কর্ত্রী। এদেরই একজন জানাল, বেটাছেলের এসব বিচার আচার করার সময় কোথায়! ওরা তো মাসের পর মাস 'লাইনে' থাকে বেওসার জন্য। পঞ্চায়েতের যে কোন রায় বা সুপারিশই চূড়ান্ত।

ইরানি বস্তিতে ধীরে ধীরে নতুন সমাজ গড়ে উঠছে। ফিকির-ফন্দি আর হাত-সাফাই ওদের জাত বেওসা হলেও শিক্ষায়-দীক্ষায় ওরা এখন এগোতে চাইছে। সকলে না হলেও কেউ কেউ ইতিমধ্যে তাদের ছেলেমেয়েদের শিলিগুড়ি শহরের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করছে। এই বস্তির পাশে একটি হিন্দি স্কুল গড়ে তোলারও উদ্যোগ দেখা দিয়েছে। ওরা চায়, ওদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে বাবু হোক।

রাজনীতির সঙ্গে এদের খুব একটা সম্পর্ক নেই। ভোটার তালিকায় নাম আছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়—কোন দলের তোমরা সমর্থক—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—যে আমাদের কাজ করবে, তাকেই আমরা সমর্থন করব। তবে ইতিমধ্যে এই ইরানি বস্তির যাযাবরদের নিয়ে রাজনীতির যে সুতা টানাটানি শুরু হয়েছে, তা সুস্পষ্ট। সাইকেল চেপে মাস্টারমশাইরা আসেন ওদের ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সর্বসময়ের কর্মী বলে এই মাস্টারমশাইরা পরিচিত। তবে মুখে তাঁরা এই মুহূর্তে রাজনীতির কথা বলেন না।

শুধু জলপাইগুড়ি নয়—পশ্চিম দিনাজপুরের ডালখোলা এবং কিষাণগঞ্জেও দুটি আঁখ বন্ধ ডিব্বাখালির আস্তানা অর্থাৎ ইরানি বস্তি গড়ে উঠেছে। এই দুই বস্তিতেও হাজার দুই যাযাবর পরিবারের বসবাস।

বৃক্ষ-শুষ্ক মরু অঞ্চলের একদা বাসিন্দা ভবঘুরে যাযাবর দল হিমশীতল হিমালয়ের কোলে উত্তরবাংলার শ্যামল স্নিগ্ধ আশ্রয়ে কেন হঠাৎ ঘর বাঁধতে শুরু করল, তা বোঝা দুষ্কর। আর কেনই বা এদের বস্তির নাম 'ইরানি কলোনি'—তাও এক রহস্য। এর রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সবুজ শ্যামল বাংলার কোমল পলি মাটিই এদের মূল আকর্ষণ, না এর পেছনে সুদূরপ্রসারী কোন রাজ-নীতির সুপরিকল্পিত সুসংহত গোপন হাত সক্রিয়, তা খতিয়ে দেখা দরকার। এই তিনটি বস্তি এলাকাতেই যুগপৎ তাড়াহুড়ো হিন্দি স্কুল গড়ে তোলার যে হঠাৎ তৎপরতা দেখা দিয়েছে, তা স্থানীয় অঞ্চলের মানুষকে বেশ সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। □

রমেন দাস

ফটো : তপন দাস





খাঁচার সামনে ভেজা বালি ছড়ান হচ্ছে

একটি চিতাবাঘের পুনর্বাসন

৮ এপ্রিল, ১৯৮৫। রাত্রের অন্ধকার তখনও ভাল করে কাটেনি। ভোর হতে বেশ কিছু দেরি আছে। হঠাৎ 'বাঘ, বাঘ' চিৎকারে তালাপাড়া গ্রামের লোকেদের ঘুম ভেঙে গেল। বিহারের ডালটনগঞ্জ শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে তালাপাড়া একটি ছোট্ট গ্রাম। এই গ্রামের এক বৃদ্ধ মজুর হল বুধন ভুঁইয়া। তার ছোট্ট মাটির ঘর, খাপরার চাল, ঘরে যাতায়াতের জন্য একটি মাত্র ছোট খোলা পথ। কোন জানলাও নেই। সেই খোলা পথ বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে বন্ধ করে বুধন ভুঁইয়ার বৃদ্ধা স্ত্রী তার ছ-সাতটি মোরগ মুরগি নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। বুড়ির বয়স হয়েছে, তাই ঘুমটা সেরকম গাঢ় হয় না, ভোর রাত্রের দিকে বুড়ি প্রায় জেগেই থাকে। তাই যখন মুরগিদের খাবার লোভে বাঁশের ঝাঁপ অল্প ফাঁক করে কোন বুনো জানোয়ার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে তখনই বুড়ি সজাগ হয়ে যায়। বাইরের ফিকে জ্যোৎস্নার আলোয় তার বাঘ বলেই মনে হয়। তাই সে ভয়ে চুপ করে পড়ে থাকে। বাঘ ভেতরে ঢুকে যখন মুরগিদের ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন বুড়ি আস্তে আস্তে উঠে বাইরে বেরিয়ে যায় ও ঝাঁপ টেনে দিয়ে চিৎকার করতে থাকে 'বাঘ, বাঘ'। গ্রামের লোকেদের ঘুম ভেঙে যায় এই চিৎকারে, তারা এসে পাথর বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে ঝাঁপটিকে আরো ভাল করে বন্ধ করে দেয়। ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে যায় বাঘ।

সকাল আটটা নাগাদ ডালটনগঞ্জে পালামৌ টাইগার প্রোজেক্টের



বনের বাঘ বনে ফিরে যাচ্ছে

অফিসে খবর আসে যে তালাপাড়া গ্রামের একটি মাটির ঘরে এক বাঘ আটকে পড়েছে। প্রোজেক্টের ডিরেক্টর অলোককুমার চট্টোপাধ্যায় সেই সময় ডালটনগঞ্জে ছিলেন না। ডেপুটি ডিরেক্টর প্রিয়রঞ্জন সিনহা তখন একটি জীপ ও ট্রেলারে একটি বড় খাঁচা ও প্রোজেক্টের ছ-সাত জন কর্মী নিয়ে ঐ গ্রামের দিকে রওনা হয়ে যান। এই সব এলাকায় গ্রামের লোকেরা সাধারণত নেকড়ে বাঘ, হায়না, চিতাবাঘ বা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সব কিছুকেই বাঘ বলে থাকে তাই শ্রীসিনহা প্রথমে গ্রামের লোকের কথায় বিশেষ গুরুত্ব দেননি। ভেবেছিলেন নেকড়ে বা হায়না জাতীয় কোন জানোয়ার ধরা পড়েছে তিনি যখন তালাপাড়া গ্রামে গিয়ে পৌঁছান তখন দেখলেন যে সেই ঘরটি ঘিরে প্রায় তিনশো লোক লাঠি, সড়কি হাতে উত্তেজিত ভাবে অপেক্ষা করছে। বাঘও ভাবেনি, এইভাবে সে হঠাৎ বন্দী হয়ে যাবে তাই বাইরে এত লোক জড়ো হয়ে যাওয়াতে ঘরের ভেতরে সেও প্রাণের ভয়ে লাফালাফি করে পালাবার পথ খুঁজতে থাকে। মাঝে মাঝে বাঘটি এত জোরে ওপর দিকে লাফিয়ে উঠছিল যে ছাদের ওপরের খাপরাগুলো ছিটকে পড়ছিল ও তার মাথা প্রায় বের হয়ে আসছিল। তখনই শ্রীসিনহা দেখতে পান যে এটি কোন নেকড়ে বা হায়না নয়, এটি একটি বেশ বড় চিতাবাঘ।

চিতা বাঘটিকে খাঁচায় ভরার চেয়ে উত্তেজিত জনতাকে সামলান বেশি কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। তবু শেষ পর্যন্ত ভিড় ঠেলে টাইগার প্রোজেক্টের কর্মীরা খাঁচাটিকে দরজার মুখে লাগান ও খাঁচার দরজা এবং বাঁশের ঝাঁপ খুলে দেওয়া হয়। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই চিতা বাঘটি লাফিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে এবং খাঁচায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন দেখা যায় যে এটি একটি ভয়ঙ্কর সুন্দর, সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত পুরুষ চিতাবাঘ।

অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে এসে এবং চারদিকে এত লোকজন দেখে চিতা বাঘটি পাগলের মত গর্জন ও লাফালাফি করে খাঁচা ভেঙে ফেলবার উপক্রম করে। লোকের ভিড়ও বাঘকে দেখার জন্য খাঁচার উপর উপচে পড়তে থাকে। শ্রীসিনহা তাড়াতাড়ি জীপের হুড খুলে তাই দিয়ে খাঁচাটিকে ভাল করে ঢেকে দেন, তখন বাঘও শান্ত হয়। এরপর লোকজনের সাহায্যে খাঁচাটিকে ট্রেলারে তুলে ডালটনগঞ্জ শহরে নিয়ে আসা হয় ও শ্রীসিনহার বাড়ির গ্যারাজে ট্রেলার শুদ্ধ খাঁচা রেখে দেওয়া হয়।

পরদিন প্রোজেক্টের ডিরেক্টর শ্রীচট্টোপাধ্যায় ট্যুর থেকে ফিরে আসেন ও চিতাবাঘটিকে দেখতে যান। বন্য, হিংস্র এই চিতাবাঘ তার বন্দীদশাকে মেনে নিতে একেবারেই রাজী নয়। লোক খাঁচার কাছে গেলেই সে তার ওপর লাফিয়ে পড়তে চায় ও গর্জন করে। আর যতক্ষণ একা থাকে দাঁত দিয়ে খাঁচার কাঠ ভাঙার চেষ্টা করে। কিছু কাঁচা মাংস তাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বাঘটি তা স্পর্শও করেনি। ডিরেক্টর ভাবেন, চিতাবাঘটিকে নিয়ে কী করা যায়। দুটি রাস্তা আছে—প্রথমটি হল এটিকে পাটনার চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়, কোন গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে চিতাবাঘটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া। মনে হয়, যে জঙ্গলে ঐ চিতাবাঘটি থাকত সেখানে তার স্বাভাবিক খাদ্য যেমন হরিণ, শুয়োর, ময়ূর, খরগোশ ইত্যাদির অভাব হওয়াতে সে গ্রামে ঢুকে গৃহস্থের ছাগল, কুকুর, মুরগি ধরার চেষ্টা করে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় মনে করেন যদি এই চিতাবাঘটিকে গ্রাম থেকে দূরে গভীর জঙ্গলে, যেখানে সে তার খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাবে, এইরকম স্বাভাবিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে বাঘটি আবার স্বাধীনভাবে সাধারণ জীবনযাপন করতে পারবে। এত সুন্দর একটি সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত বন্য চিতাবাঘকে সারা জীবনের জন্য চিড়িয়াখানার বন্দীদশায় পাঠিয়ে দিতে তাঁর মন চায় না। এখানে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে চিতাবাঘটি সাধারণ ক্যাটল লিফটার (cattle lifter) নয় কারণ ঐ গ্রাম বা তার আশেপাশের কোন গ্রাম থেকে নিয়মিত গরু ছাগল লোপাট হবার কোন খবর আগে পাওয়া যায়নি। তাই শ্রীচট্টোপাধ্যায় চিতাবাঘটিকে টাইগার প্রোজেক্টের কোর এরিয়াতে (core area) কুজরুম বনে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

সেইমত ১১ এপ্রিল সকালে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দুটি জীপ ডালটনগঞ্জ শহর থেকে রওনা হয়। একটি জিপের পেছনে ট্রেলারে চিতাবাঘের খাঁচা। অন্য জিপে শ্রীচট্টোপাধ্যায়, শ্রীসিনহা ও টাইগার প্রোজেক্টের ছ'সাতজন কর্মচারী। এই যাত্রায় আমিও ক্যামেরা নিয়ে ও'দের সঙ্গী হই। ডালটনগঞ্জ শহর থেকে কুজরুম প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে। প্রথমে

PHILIPS

ফিলিপ্স

সাধারণ বাল্‌বের অঘটনের কাহিনী!



এই ছবিতে যে বাল্‌বটি দেখছেন,
নেকেই এর আদ্যোপান্ত কিছু না
নেশুনেই এটা কিনে ফেলেন।

বিশ্বাস হচ্ছে না?

দেখুন, ব্যাপারটা এই রকম ঘটে।

সব বাল্‌বই দেখতে সমান...
-শুরুতে সবই চমৎকার। কিন্তু কিছুকাল
রই যেটি আজেবাজে, তার কেচ্ছা-কাহিনী
পনিই বেরিয়ে পড়ে। বদগুণ একে-একে
শ পায়, যেমন আলো কমছে তো কমছে,
লী খরচ পুরোমাত্রায় চড়ছে, তারপর
ব 'ফুট্‌' করে খতম।

ঠিক চুপ্‌সে যাওয়া বাল্‌বের মতন।

তাহলে, সত্যিই তো, আপনি কি করে চিনবেন কোন বাল্‌বটা নিখুঁত আর সেরা।

দেখুন সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হ'ল এমন এক নামী বাল্‌ব কিনুন, যার ওপর ৫০ বছরেরও বেশীকাল ধরে জনগণের অগাধ বিশ্বাস।

ফিলিপ্‌স...এমন এক কোম্পানী, যারা প্রত্যেকটি বাল্‌বকে ১০০% ভাগ যাচাই-পরখ করে, যার ফলে আপনার খরচা ওয়াটের ১০০% ভাগ উশুল হয়ে আসে।

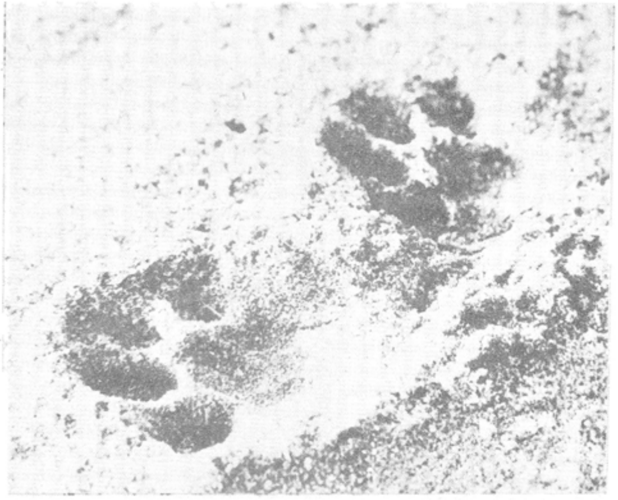
সুতরাং, ১০০% নিশ্চিত হোন। শুধু ফিলিপ্‌স-ই কিনুন।



সব বাল্‌ব-ই দেখতে সমান, কিন্তু ফিলিপ্‌স নাম সেরা বলে প্রমাণ

ফিলিপস – গত পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল ভারতের ঘরে-ঘরে বিশ্বস্ত নাম

ঠিক হয়—কুজরুমের বুড়হা নদীর বালির সমতল চড়ায় বাঘটিকে ছাড়া হবে। তাহলে ফটো তোলার ও বালির ওপর বাঘটির পায়ের ছাপ তোলার সুবিধে হয়। কুজরুমের জঙ্গলে প্রচুর বুনো হাতি পাওয়া যায়। এই হাতিদের সামনাসামনি পড়ে গেলে যেকোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। তাই নদীর ধারে গাড়ি থামিয়ে প্রথমে দুজন ফরেস্ট গার্ডকে দেখতে পাঠান হয় নদীর বেডে কোন হাতি আছে কিনা। গার্ডরা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বলে ন'দশটি হাতি সামনেই নদীর জলে স্নান করছে। তখুনি আমাদের জিপ দুটি ওখান থেকে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু ঘোরাতে গিয়ে দেখা যায় যে আমাদের জিপের একটি চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেছে। চাকা বদলানো দরকার। সামনেই নদীর বুকে হাতির দল। আর সেখানেই আমাদের জিপ অচল। যদি চাকা বদলাতে বদলাতে হাতিরা স্নান করে এ রাস্তা দিয়ে ফেরা ঠিক করে তাহলে আমাদের আর রক্ষে নেই। যাহোক কী আর করা যাবে। ভগবানের নাম করতে থাকলাম। তার মধ্যে চাকা বদল হল ও আমরাও আবার রওনা হলাম। এবার যাবার কথা বুড়হা নদী ও কোয়েল নদীর সঙ্গমে বাগে চম্পার ঘাসের মাঠে। বাগে চম্পা পৌঁছে দেখা গেল আশেপাশে কোথাও জংলী হাতি নেই। তখন ট্রেলার থেকে চিতাবাঘটির খাঁচা সেখানে নামান হল। চিতাবাঘটিকে চিহ্নিত করে রাখার জন্য শ্রীচট্টোপাধ্যায় পিচকারীতে লাল রঙ ভরে বাঘটির পেটের সাদা অংশটিকে লাল রং করে দিলেন। কারণ জঙ্গলে ছেড়ে দেবার পর বাঘটি যদি আবার কোন গ্রামের আশেপাশে চলে আসে ও গরু ছাগল ধরা শুরু করে তাহলে লাল রং দেখে একে সহজেই দূর থেকে চেনা যাবে। তারপর খাঁচাটিকে এক পাশে কাৎ করে তার দরজার কড়াতে একটি মোটা দড়ি বাঁধা হল। দড়ির অন্য প্রান্তটি নিয়ে একটি ফরেস্ট গার্ড প্রায় দেড়শো ফুট দূরে দাঁড় করান জিপে বসল। খাঁচার দরজার সামনে বেশ কিছু ভেজা বালি ছড়িয়ে দেওয়া হল যাতে চিতাবাঘটি খাঁচা থেকে বেরোলেই তার পায়ের ছাপ বালির ওপর পড়ে। সেই পায়ের ছাপের



ভেজা বালিতে চিতার পদচিহ্ন

প্লাস্টার দিয়ে ছাঁচ তুলে রাখা হবে যাতে প্রয়োজন হলে পরে বাঘটিকে সনাক্ত করার সুবিধে হয়। জিপের ওপর দুজন ফরেস্ট গার্ডও বন্দুকে গুলি ভরে তৈরি থাকল কারণ তিন দিনের ক্ষুধার্ত, বন্দী, উত্তেজিত বন্য চিতাবাঘ যদি হঠাৎ খাঁচা থেকে বেরিয়েই জিপের দিকে লাফিয়ে আসে তাহলে ফরেস্ট গার্ডরা আকাশের দিকে ব্ল্যাংক ফায়ার করবে। জিপের ওপর দাঁড়িয়ে ক্যামেরা নিয়ে আমিও তৈরি যাতে চিতাবাঘটির ঠিক খাঁচার ভেতর থেকে বেরোবার মুহূর্তে ফটো নিতে পারি। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের হাতেও আর একটি ক্যামেরা। খাঁচা থেকে প্রায় দেড়শো ফুট দূরে জিপ দুটি ইঞ্জিন চালু রেখে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে সামান্যতম বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে রওনা হতে পারা যায়। শেষ পর্যন্ত সেই মুহূর্তটি এল। শ্রীচট্টোপাধ্যায় ইশারা করলেন, ফরেস্ট গার্ড আস্তে আস্তে দড়ি ধরে টানল। চারিদিক স্তব্ধ, জিপের ওপর থেকে সকলেই সাগ্রহে দুরু দুরু বুকে খাঁচার দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে খাঁচার দরজা অর্ধেকটা খুলল। প্রথম আধ মিনিট চিতাবাঘটি কিছু করল না, তারপর মাথা ও শরীরের অর্ধেকটা বার করে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে অদ্ভুত সাবলীল ভঙ্গিমায় সবুজ ঘাসের বুকে হলুদ বিদ্যুতের চমক তুলে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রথমে কিছুক্ষণ জঙ্গলের ভিতর থেকে চিতল হরিণ ও হনুমানদের অ্যালার্ম কল শোনা গেল। তারপর সব শান্ত। আমি একবারই ক্যামেরার শাটার টেপার সুযোগ পেলাম।

বাঘটিকে সাফল্যের সঙ্গে জঙ্গলে ছেড়ে দিতে পারায়, বিশেষ করে কোন দুর্ঘটনা না ঘটায় সকলেরই মনে খুব আনন্দ। খাঁচার সামনে ভিজে বালির ওপর চিতাবাঘের পায়ের খুব সুন্দর ছাপ পড়েছিল। তার প্লাস্টার কাস্ট করা হল ও ফটো তোলা হল। তারপর আমরা ফিরে চললাম ডালটনগঞ্জের দিকে। আমাদের রিটার্ন জার্নিটাও খুব রোমাঞ্চকর হল। কারণ ফিরতি পথে আমরা দুবার জংলী হাতিদের সামনে পড়লাম। প্রথমবার বাগে চম্পা থেকে কিছুদূর এগিয়ে রাস্তার ওপর একটি কালভার্ট তৈরি হচ্ছিল, সেজন্য সেখানে রাস্তার ওপর একটি ডাইভার্সান। সেই ডাইভার্সানে আবার কিছু জল কাদা জমে আছে। সেখানে পৌঁছবার আগেই দেখলাম রাস্তার ওপর সাত আটটি হাতির একটি দল দাঁড়িয়ে আছে। হাতিরা কিছুতেই আর আমাদের রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে না। আমরা প্রায় মিনিট দশেক ধরে গাড়িতে বসে। তারপর আস্তে আস্তে হাতির দল রাস্তা ছেড়ে যেই একটু জঙ্গলের দিকে গেছে তখনই আমরা চাইলাম ফুল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে ডাইভার্সান পেরিয়ে আসতে। আমাদের জিপটি তো ভালভাবেই হাতির দল ও ডাইভার্সান পেরিয়ে এল, কিন্তু চিন্তা হল পরের জিপটির জন্য। কারণ তার সঙ্গে ট্রেলার লাগান। যদি কোনরকমে জিপটি ডাইভার্সানের জায়গায় জলে কাদায় আটকে যায় তাহলে হবে সবথেকে মুস্কিল। যাহোক সেরকম কোন অঘটন ঘটল না, দ্বিতীয় জিপটিও ভাল ভাবে ডাইভার্সান পেরিয়ে চলে এল।

দুপাশে গভীর জঙ্গল, মাঝে মাঝে চিতল হরিণ, বাইসন, সম্বর, ময়ূর ইত্যাদির দল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে আসছে বলে আমরা আর কোথাও না থেমে তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছি। হঠাৎ রাস্তার ধারেই আবার দেখি প্রায় দশ বারটি হাতির একটি দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশের পাতা খাচ্ছে। তাদের সঙ্গে দুটি বাচ্চা হাতিও আছে। প্রথমে আমাদের জিপ, তাতে শ্রীচট্টোপাধ্যায়, শ্রীসিনহা ও আরও দু-তিনজন লোক। পেছনের জিপে ট্রেলার লাগান ও তাতে আরও পাঁচজন লোক। আমরা ভাবলাম খুব তাড়াতাড়ি হাতির দলটিকে পার করে যাব। কিন্তু একটু এগোবার সঙ্গে সঙ্গেই দলের চার-পাঁচটি হাতি শুঁড় তুলে কান খাড়া করে চিৎকার করতে করতে আমাদের জিপের দিকে তাড়া করে এল। জিপের ড্রাইভার প্রথমে জিপটি ব্যাক করার চেষ্টা করল, কিন্তু পেছনে ট্রেলার সমেত দ্বিতীয় জিপটি থাকায় ব্যাক করা সম্ভব হল না। ভয়ে কারুর মুখে কোন কথা নেই, নিঃশ্বাস ফেলতেও বোধহয় ভুলে গেছি। কেবল স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছি এইবার হাতির দল এসে আমাদের জিপ উল্টে দেবে। কিন্তু শ্রীচট্টোপাধ্যায় অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ফরেস্ট গার্ডের হাত থেকে বন্দুক নিয়ে সামনের হাতিটির মাথার ওপর দিয়ে পরপর দুটি ফায়ার করলেন। বন্দুকের আওয়াজে হাতিদের তাড়া করে আসা বন্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হাতিদের পার করে জিপ নিয়ে এগিয়ে গেলাম। এরপর পথে আর কোন ঘটনা ঘটল না। রাত নটা নাগাদ নির্বিঘ্নে ও সাফল্যের সঙ্গে চিতাবাঘটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দিতে পারায় খুশী মনে ডালটনগঞ্জ শহরে ফিরে এলাম।

চিতাবাঘটিকে কুজরুমের বনে ছেড়ে দেবার পর প্রায় চার মাসেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত সেখান থেকে চিতাবাঘটির অস্বাভাবিক গতিবিধির কোন খবর আসেনি বা আশেপাশের কোন গ্রামের গরু ছাগল মুরগি ধরারও কোন খবর আসেনি। আশা করা হচ্ছে, অনুকূল পরিবেশে চিতাবাঘটি তার স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। □

লীনা চট্টোপাধ্যায়

ফটোঃ লেখিকা

চীনের আকাশে নতুন তারা – ৯

চীনের চাষী ব্যক্তিগত জমির মালিক হলেন

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মুসলমানদের মধ্যে যেমন ফজলুর বা আবদুল, হিন্দুদের মধ্যে তপন বা ইংরেজদের মধ্যে মিঃ স্মিথ, তেমনি চীনাদের মধ্যে ওয়াং নামটি খুবই প্রচলিত। আমি যে তরুণ চাষীর বাড়ি গেলাম তাঁর নামও ওয়াং।

ওয়াং নতুন দোতলা বাড়ি তৈরি করেছেন। ওপর-নিচ মিলিয়ে ছখানা ঘর। সবশুদ্ধ ৩০০ব. মিটার জমি। ১০০ব. মিটারে বাড়ি তৈরি হয়েছে। বাকি অংশে বাগিচা। বেশ খোলামেলা পরিবেশ। ওয়াং-এর পরিবারে চারজন প্রাণী। স্বামী-স্ত্রী, বৃদ্ধা মা আর এক বাচ্চা।

ওয়াং বললেন, ১৯৭৯ সালে বাড়িটি তৈরি করেছি। খরচ পড়েছে ১১ হাজার ইউয়ান অর্থাৎ পঞ্চান্ন হাজার টাকা। চীনে বাড়ি তৈরির সরঞ্জাম সস্তা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে এমন বাড়ি দু লাখ টাকা পড়ে যেত।

বাড়িতে খুব একটা আসবাবপত্র নেই। বসার ঘরে গোটা কয়েক কাঠের চেয়ার। সেখানেই আমরা বসলাম। ওয়াং আমাদের ওপরে নিয়ে গিয়ে সব ঘর দেখালেন। ভেবেছিলাম এখানেও প্রথামত চা আসবে। কিন্তু ওয়াং কোন কিছু অফার করলেন না। বোধহয় এমনিতেই আমার লাঞ্চের সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই।

ওয়াং পরিবারের দেড় হেক্টর জমি আছে। যেটি কমিউনের আওতায় পড়ে। অর্থাৎ এই জমির প্রকৃত মালিক কমিউন। ওয়াং যতদিন বেঁচে আছেন, চাষ করে যাচ্ছেন। বলা যেতে পারে এটি যৌথ মালিকানার জমি। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত জমি আছে। তার পরিমাণ ১০০০ বর্গ মিটার। এই জমি বাস্তুজমির বাইরে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এই বাড়ি করার আগে আপনি কোথায় বাস করতেন ?

ওয়াং জবাব দিলেন, আগে ছোট একটা বাড়িতে থাকতাম। মাত্র ৫০ বর্গ মিটার জায়গা ছিল সেখানে।

চীনে এখন চাষের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব প্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে তার ফলে উৎপাদন বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে চাষীদের ব্যক্তিগত জমি দেওয়ার ফলে চাষীদের আয় বাড়ছে। ওয়াং-এর কথাই ধরুন। তিনি দেড় হেক্টর জমির জন্য কমিউনের কাছে দায়ী। কমিউন তাঁকে ন্যায্য দামে বীজ সার সরবরাহ করবে। ট্রাক্টর দেবে। তার বদলে তিনি উৎপন্ন ফসল নির্ধারিত দামে কমিউনকে বিক্রি করবেন। এছাড়া তাঁর বাস্তুজমি বা ব্যক্তিগত জমির ফসলের সমস্ত মুনাফা তাঁর। তিনি সেই ফসল বাজারে গিয়ে প্রতিযোগিতামূলক দরে বিক্রি করতে পারেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কমিউনের জমিতে ফলান সব ফসলই কি আপনাদের কমিউনকে বিক্রি করে দিতে হয় ?

: না। কতটা বিক্রি করব সেটা অবশ্য কমিউন ঠিক করে দেবে।

: কী চাষ করবেন সেটা কে ঠিক করেন ?

: সেটা সরকার ঠিক করে দেন। যেমন গত বছর আমি ধান চাষ করেছি। এবার বুনেছি ভেজিটেবল।

: চাষ কি আপনাকে নিজে করতে হয় ?

: প্রধানত নিজেই করতে হয়। তবে আমি আমার পরিবার এবং আত্মীয়দের কাজে লাগাতে পারি।

: চাষের কাজে সরকার কতটুকু সাহায্য করেন আর আপনাকেই বা কী দিতে হয় ?

: চাষ করার সমস্ত খরচ-খরচাই আমার। যেমন, সার, বীজ। তবে সরকার থেকে বিনা ভাড়ায় ট্রাক্টর পাওয়া যায়। দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতি হলে সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। মূলধন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ হিসাবে পাওয়া যায়। এর জন্য সুদ দিতে হয় ৬ শতাংশ। কমিউনের জমির ফসল কমিউনকে বিক্রি করতে হয়। আগে ব্যক্তিগত জমির ফসলও কমিউনকে বিক্রি করতে হত। ১৯৭৯ সাল থেকে সেই আইন উঠে গেছে। এখন আমরা হাটে গিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত জমির ফসল বিক্রি করতে পারি।

: জমি থেকে আপনার কীরকম লাভ হয় ?

: ব্যক্তিগত ক্ষেত থেকে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বছরে ২৬০০ ইউয়ান হাতে আসে। কমিউনের জমি থেকেও যে টাকা লগ্নি করি তার ৩০-৪০ শতাংশ মুনাফা হয়ে থাকে।

: আপনি যে জমিতে চাষ করছেন, আপনি শহরে চলে গিয়ে সেই জমিতে অন্য কাউকে ভাগচাষী হিসেবে বসাতে পারেন ?

ওয়াং বললেন : না। আমি যতদিন নিজে চাষ করব ততদিনই কমিউনের জমির ওপর আমার অধিকার থাকবে। আমি শহরে চলে গেলে এ জমি অন্য কাউকে দেওয়া হবে। তবে, আমার ব্যক্তিগত জমির ওপর মালিকানা ঠিকই থাকবে। কমিউনের জমি আমি মরে গেলে আমার ছেলেও পাবে না। অবশ্য সে যদি নিজে চাষী হয় তখন সে কমিউনের কাছে জমির জন্য আবেদন করতে পারে। কিন্তু আমার জমিই যে পাবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জমি সে উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে।

এই প্রসঙ্গে চীনের কৃষি ও ভূমিসংস্কারের কথা কিছু বলি। ১৯৪৯ সালে বিপ্লবের ঠিক পরপরই চীনের ভূমিসংস্কার শুরু হয়। পুরনো চীনে মোট আবাদী জমির শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগের মালিক ছিলেন জমিদার আর ধনী কৃষকেরা। খাজনার হার ছিল অস্বাভাবিক রকমের বেশি। ফসলের অর্ধেক অথবা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ খাজনা হিসেবেই



ঠিকায় জমি নিয়ে ফুলের চাষ চলছে

চলে যেত। বিপ্লবের পর জমিদার ও ধনী কৃষকদের প্রায় ১২ কোটি একর জমি বাজেয়াপ্ত করে ৩০ কোটি ভূমিহীন চাষীর মধ্যে বণ্টন করা হয়। আমাদের দেশে যেমন কৃষির যৌথকরণ বা সমবায়করণ হয়নি, একেকটি চাষী পরিবার একেকটি ইউনিট—চীনেও ছিল তাই। এতে উৎপাদন খুব বেশি বাড়েনি। স্বভাবতই তখন সমবায়করণের প্রশ্নও ওঠে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সালের প্রথমদিক পর্যন্ত কয়েকটি কৃষি পরিবারকে নিয়ে একেকটি চাষী দল গঠন করা হয়। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কৃষি সমবায়ের ওপর প্রস্তাব নেন। এই প্রস্তাবের পর ওই কৃষি দলগুলিকে পরিণত করা হয় প্রাথমিক সমবায়ে। ধীরে ধীরে এই সমবায়গুলিকে সমাজতান্ত্রিক সমবায়ে পরিণত করা হয়। এর ফলে জমির ওপর কৃষকদের আর কোন ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। সমবায়ের অধীনে সমস্ত জমি ও চাষবাসের হাতিয়ার এবং সরঞ্জাম পরিণত হয় যৌথ সম্পত্তিতে। কৃষকেরা শুধু শ্রম অনুযায়ী মজুরি পেতে থাকেন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শুধুমাত্র চাষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকায় সমবায়গুলি মুনাফাজনক হয়ে উঠছে না। উৎপাদন বাড়ানর তাগিদে আরও কার্যকর সংগঠন সৃষ্টি করা জরুরি হয়ে পড়ে। ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রামাঞ্চলে গণ কমিউন গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব করে। ১৯৫৮ সালের শেষে দেখা যায় সারা দেশের কৃষি সমবায়গুলি কমিউনে পরিণত হয়েছে। এই কমিউন ষাটের দশকে এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তা গ্রামাঞ্চলে একটি যৌথ পরিবারের রূপ ধারণ করে। কমিউনের সদস্যরা কমিউনের রান্নাঘরে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে থাকেন। ব্যক্তিজীবনেও পারিবারিক ইউনিটগুলির কর্তৃত্ব ভেঙে গিয়ে আদিম যুগের মত এক ধরনের যৌথজীবন শুরু হয়ে যায়। পরবর্তীকালে অবশ্য কমিউনের এই 'কমন কিচেন' বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বর্তমানে চীনে ৫২,০০০-এরও বেশি গণ কমিউন আছে। এখন কমিউন শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক নয়। সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতিই কমিউনকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়ে থাকে। কৃষি ছাড়াও বন, পশুপালন, মৎস্য চাষ, শিল্প-বাণিজ্য সমস্ত কিছুই কমিউনের পরিচালনায় হয়ে থাকে। কমিউন একটি ত্রিস্তর কাঠামো। একটি স্তরে আছে কমিউন, আরেকটি পর্যায়ে উৎপাদনকারী ব্রিগেড, আরেকটি পর্যায়ে উৎপাদনকারী টিম। প্রতিটি স্তরের অধীনে বিভিন্ন উৎপাদনকারী



কৃষকরা সরকারী ভাণ্ডারে ফসল বেচার পথে

প্রতিষ্ঠান আছে। সেগুলি বিকেন্দ্রীভূত অবস্থাতেই পরিচালিত হয়। যেমন, উৎপাদনকারী টিম কতগুলি বিষয় নিজেরাই পরিচালনা করে। তার লাভ-লোকসানের দায়িত্বও তাদের। এই সমস্ত স্তরের যা আয় হয় তা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় প্রত্যেকের প্রাপ্য কর্ম অনুযায়ী। অর্থাৎ যে যেমন কাজ করবেন তদনুসারে তাঁর মজুরি ধার্য হবে। কমিউনের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে পার্টটাইম কাজে নিযুক্ত থাকতে পারেন। যেমন, তাঁরা গবাদি পশু পালন করতে পারেন। ব্যক্তিগত জমিতে ইচ্ছানুযায়ী ফসল ফলিয়ে তা বিক্রি করতে পারেন। ব্যক্তিগত বৃত্তিতেও নিযুক্ত হতে পারেন। যেমন, চাষ করার পর হাতে যে সময় থাকে সে সময় কোন কুমোর পুতুল তৈরি করতে পারেন বা কোন প্রামাণিক লোকের চুল কাটতে পারেন। এই উপার্জন একান্তভাবে তাঁরই।

বর্তমানে চীনের মোট কৃষি উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ আসে যৌথ অর্থনীতি থেকে। শতকরা চারভাগ আসে রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে আর শতকরা ১৫-১৬ ভাগ আসে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে।

১৯৮৩ সালে কমিউন ও ব্রিগেড প্রতিষ্ঠিত নানা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার। এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে নানা কলকারখানা, পরিবহন সংস্থা, প্রভৃতি। মোট তিন কোটি পাঁচ লক্ষ লোক কাজ করেন এইসব প্রতিষ্ঠানে। এর ফলে গ্রামের ভেতরেই তিন কোটির ওপর লোকের কর্মসংস্থান হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষকে আর শহরে ভিড় করতে হচ্ছে না। আমাদের দেশে গান্ধীজীও এটা চেয়েছিলেন। চীনে গিয়ে আমার বারবার মনে হয়েছে গান্ধীজীর নীতিকেই যেন রূপায়িত করছে চীন। "সহজ সরল জীবনযাত্রা, গ্রামীণ সম্পদ কাজে লাগান—এসবই চীন নিখুঁতভাবে করছে। গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলির আয় বছরে ছ হাজার একশো চল্লিশ কোটি ইউয়ান।

আমাদের দেশে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েতের আয় কোথায়? একমাত্র আয় গ্রামের মানুষের কর। কিন্তু দরিদ্র মানুষ কোথা থেকে কর দেবেন! আমি গ্রামে দেখেছি গরিব মানুষ পুরসভার কর দিতে পারছেন না বলে পেয়াদা এসে ঘটিবাটি ক্রোক করে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ জমিদার চলে গিয়ে পুরসভার অত্যাচার এল। কিন্তু পুরসভাগুলি যদি সম্পদ উৎপাদন করে তাহলে আর কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না।

চীনে আর একটা বড় কাজ হয়েছে গ্রামে। অসংখ্য ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করেছে চীন। সারা দেশে ৯০ হাজার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। এগুলি আবার বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। শতকরা ৮৬ শতাংশ গণ কমিউনে জলবিদ্যুৎ থেকে উৎপন্ন শক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ বেড়েছে ন গুণ। চীনের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন ৬৫·৮৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট। ১৯৪৯ সালের ৩৫ গুণ।

সারা চীনে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ১৪১৯টি। এদের প্রত্যেকের উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোওয়াটের ওপর। ৫৫টি বড় ধরনের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা আড়াই লক্ষ কিলোওয়াট। চীনের সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গাংসু প্রদেশের হোয়াংহো নদীতে। এখানে ১·২২৫ মিলিয়ন

কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই ড্যামটি ১৪৭ মিটার উঁচু ও ২০৪ মিটার দীর্ঘ। এছাড়া চীনে বাতাস থেকে বিদ্যুৎ হচ্ছে বিদ্যুৎ হচ্ছে ভূগর্ভস্থ গরম জল থেকে, ঢেউ থেকে, মিথেন গ্যাস থেকে। এক কথায় যাবতীয় শক্তি উৎসকে তাঁরা ব্যবহার করছেন। আবার যৌথ কৃষি ব্যবস্থার কল্যাণে চীনে পশু দিয়ে চাষ করা দ্রুত কমে যাচ্ছে। সে জায়গায় আসছে ট্রাক্টর। এখন বৃহৎ ও মাঝারি ট্রাক্টর দিয়ে শতকরা ৪১ ভাগ জমি চাষ হয়। মোটর চালিত পাম্পসেটের সংখ্যা সাত কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ। চীনে শতকরা ৮০ ভাগ চাষযোগ্য জমিতেই খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। চীনাদের প্রধান খাদ্য ভাত। দক্ষিণ চীনে চাষ হয় ধানের আর উত্তর-পশ্চিম চীনে গম, ভুট্টা, জোয়ার ও আলুর। শতকরা ২৮ ভাগই ধানী জমি। মোট শস্যের ৪৩ ভাগই ধান। অর্থনৈতিক শস্যের মধ্যে আছে পাট, থোং তেল, রেশম, চা, তুলো, তৈলশস্য।

এককথায় চীন ও ভারতের ভূপ্রকৃতি এক। চাষবাসও এক'। ভারতের মত চীনা রেশমের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। সাংহাই হল রেশম শিল্পের বড় কেন্দ্র। সুন্দর সুন্দর রেশমের কাপড় পাওয়া যায় চীনে। প্রতি বর্গমিটারের দাম ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকার মত। চীনের যে কোন বড় হোটেলের শপিং আর্কেডে গেলে আপনি সিল্ক আর চা পাবেন। সিল্কের পর চীনের চায়ের খুব নামডাক। আর সারা পৃথিবীকে চা খেতে শেখান চীনারাই সর্বপ্রথম। চীনে নানা ধরনের চা হয়। মুখ্যত হয় দু ধরনের চা। সবুজ চা ও লাল চা। সবচেয়ে বেশি চা হয় ছাংজিয়াং উপত্যকায়। হাংযৌ-এর লোংজিং চা, আনহুইয়ের লাল চা, ইয়ুন্নানের লাল চা ও সবুজ চা সব দেশে বিখ্যাত।

ওয়াংয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কমিউনের ডাইরেক্টর মাদাম মাই উয়ে হুই আমাকে লাঞ্চে নিয়ে গেলেন। কমিউনের কর্মীদের জন্য ক্যান্টিনের এক পাশে আমাদের জন্য বিশেষ লাঞ্চের ব্যবস্থা হল। চীনে আমাদের দেশের মত মদ্যপানকে ছোট নজরে দেখা হয় না। বিয়ার তো কোকাকোলার মত সর্বত্র বিক্রি হয়। অতিথি এলে টেবিলে মদ পরিবেশন করাও রীতি। আমাদের টেবিলেও পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যের খাতিরে আমি জল ছাড়া কোন পানীয়ই স্পর্শ করছিলাম না।

খেতে বসে মাদাম হুই আমাকে কমিউনের সমৃদ্ধির ইতিহাস শোনাচ্ছিলেন। ১৯৫৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর এই কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয়। সাংহাই-এর প্রথম কমিউন এটি তার আগে ছিল সিনিয়র কর্পোরেশন। ৩০টি পরিবার নিয়ে এমন ধারা কর্পোরেশন গঠিত হত। অনেকগুলি কর্পোরেশন নিয়ে এক একটি সিনিয়র কর্পোরেশন হয়। এই কমিউনে ৫৩৪০টি কৃষি পরিবার যুক্ত আছেন। ১৩০০ হেক্টর জমি তাঁরা চাষ করেন। ফার্মের নিজস্ব শ্রমিক আছে ৬০০০। প্রত্যেকের মাথা পিছু জমি ৬০০ বর্গমিটার।

১৯৭০ থেকে কমিউনের অধীনে শিল্পগুলির উন্নয়ন শুরু হয়। প্রথম শিল্পটি ছিল জামাকাপড় তৈরির। তারপর হয় মোটর বাস তৈরির কারখানা। শিল্প থেকে যে লাভ হয় ঐ টাকায় চাষীদের সার কেনা হয়। জমির উন্নতিতে লাগান হয়। বিনা মূল্যে চিকিৎসা করা হয়। এখন সব শুদ্ধু ১৮টি শিল্প এই কমিউনে। ১৯৮৪ সালে ৫ কোটি টাকা মুনাফা হয়েছে। গ্রামটি আজ শহরের রূপ নিয়ে নিয়েছে। এখন মনে হয় কোন বিরাট শিল্প শহরে এসেছি যেন চিমনির ধোঁয়া, চওড়া পিচঢালা রাজপথ লোকজনের ভিড়। অথচ গ্রামের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে বাঁচানর জন্যই এই আয়োজন। □

(চলবে)

ফটো : সংগৃহীত

হাত দেখে মানুষ চিনুন



হাতের রেখা দেখে মানুষ চেনা যায় একথা বলেন জ্যোতিষীরা। কিন্তু হাতের গড়ন দেখেও কি লোকচরিত্র বোঝা যায়?

এই গুচ্ছপ্রতিবেদনে হাত দেখে মানুষ চেনার বিচিত্র চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রকাশিত হল। সেই সঙ্গে প্রকাশ করা হল ইংলণ্ডে জ্যোতিষ চর্চা নিয়ে আর একটি স্বতন্ত্র প্রতিবেদন।

হাতের লেখায় চরিত্র

মানুষের ব্যক্তিত্ব বোঝার প্রকাশ করার এবং চরিত্র জানার যতগুলো শ্রেষ্ঠ উপায় আছে, তার মধ্যে তার হাতের লেখা অন্যতম। রকিফেলার বলতেন, 'যে যেমনভাবে যাই লিখুক না কেন, তার চরিত্র তার মধ্যে প্রকাশ পাবেই'। বাস্তবিকই হাতের লেখাকে বিশ্লেষণ করে মানুষের চরিত্র, বিশেষত তার মন মেজাজ, ব্যবহার, কেমন আছে এবং যদি তাতে কিছু অসংগতি থাকে তবে তার সার্বিক উন্নতির জন্য কেমনভাবে হাতের লেখাকে ব্যবহার করা যায়, তা সবই বলা যায়। হাতের লেখার সাহায্যে একজন মানুষের জীবনের প্রায় সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। যেমন ধরুন কেউ প্রশ্ন করল, আমি কি খুব বাস্তববাদী? স্বার্থপর? কৃপণ? কর্তব্যনিষ্ঠ? অসাবধানী? সৎ? স্বাস্থ্যবান? ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন? বিশ্বাসী? প্রেমিক? সংস্কৃতিবান? উদার? উদামী? এরকম প্রায় পঞ্চাশের উপর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। এ নিয়ে বিদেশে বহু গবেষণা আজও হচ্ছে। এর উপর বহু বইও বিদেশি ভাষায় আছে। তবে যতদূর জানি বাংলায় এ সম্পর্কে একটিও ভাল বই নেই। স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি ব্যাপারটা।

একটা মজার ব্যাপার দেখুন, কোন দুজনের লেখা (একই বিষয়ে হলেও) কখনই এক হতে পারে না – তারা যদি চায়ও। আরও একটা ব্যাপার, শিশুর লেখা শিশুর মত হবে, বড়দের লেখা বড়দের মত হবে। যদি কখনও এর বিপরীত হয়, তবে তাদের চরিত্রও বিপরীত হতে বাধ্য।

হাতের লেখাকে বিশ্লেষণ করতে গেলে কতকগুলো প্রাথমিক নিয়ম আপনাকে অবশ্যই মানতে হবে :

১। কখনও একটা নমুনা নেবেন না। বিশ্লেষণের জন্য দুটো বা তিনটে এমন নমুনা নিন, যা বেশ কয়েক সপ্তাহ অন্তর লেখা হয়েছে।

২। ফাউণ্টেন পেনে লেখা হয়েছে এমন নমুনা নিন।

৩। শুধুমাত্র বিশ্লেষণের জন্য লেখা হয়েছে এমন নমুনা নেবেন না। অর্থাৎ স্বাভাবিক লেখা সংগ্রহ করুন।

৪।খামের উপরে লেখা ঠিকানা নমুনা হিসাবে ব্যবহার করবেন না।

৫। সাদা কাগজে লেখা নেবেন। কারণ তাতে মার্জিন, লাইন ইত্যাদি জানা যায়।

৬। কাউকে আপনি এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখতে বলতে পারেন :

(ক) ইংরাজিতে তার পুরো নাম, ঠিকানা।

(খ) আবহাওয়া সম্বন্ধে একটা বাক্য। যেমন It is very warm today.

(গ) তার নিজের সম্পর্কে কোন কথা। যেমন I like to see sea.

(ঘ) বড় হাতের কিছু অক্ষর।

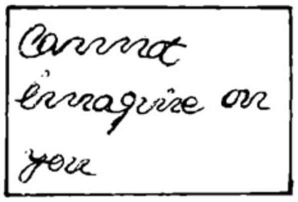
(ঙ) 1-10 পর্যন্ত সংখ্যা।

এইবার আপনি লেখাগুলো-সামনে ফেলে বিশ্লেষণ করতে শুরু করুন। প্রথমে দেখুন সেগুলো ছেলে না মেয়ের লেখা। তারপরে লেখকের বয়স নির্ধারণ করুন। এবার আস্তে আস্তে অন্য বিষয়গুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সত্যিকার ধৈর্য নিষ্ঠা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে শুরু করুন। মনে রাখবেন আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করছে আপনি এতে কতখানি সফল হতে পারবেন। এবার শুরু করি –

Signature থেকে পাবেন Individuality

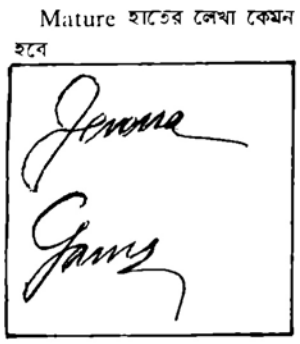
Style থেকে পাবেন Sharpness of Mind

Childish লেখা কেমন ও তার কী ফল লক্ষ্য করুন :



উপরের লেখাটির 'M' এবং 'N' অক্ষরগুলি গোল ধরনের। এটি যদি ১৪ বছর বা তার কম বয়সের কারুর লেখা হয়, তবে এটি তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক লেখা এবং সে তার আচার-আচরণ অনুযায়ী ঠিক ভাবেই এগোচ্ছে। কিন্তু এটি যদি কোন প্রাপ্তবয়স্কের লেখা হয় তবে তিনি অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত, আবেগপ্রবণ, অলস এবং স্নায়বিক দিক দিয়ে দুর্বল।

Mature হাতের লেখা কেমন হবে

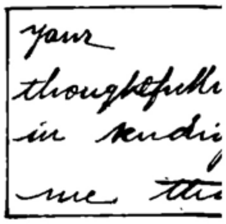


'M' এবং 'N'-গুলি কোণের সৃষ্টি করেছে। এঁরা যে কোন পরিবেশে সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়ে

নিতে প্যারেন। প্রতি
নিজেদের সুচিন্তিত চি
আছে। অথচ অপরের ম
মূল্য দেন। প্রতিবেশী হিস
ভাল।

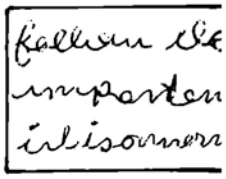
নিজের বাড়িতে অথবা
'বিশ্বাসী' কাজের লোক খুঁ
লক্ষ্য করুন বিশ্বাসের
অনুযায়ী তাদের হাতের লে
হবে

১।



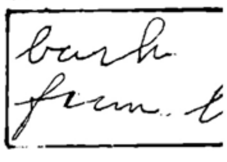
লাইন সোজা এবং
শব্দের মাঝে শূন্যস্থানগু
সমান। এরা অর্থের দিক দি
অন্যান্য দিক দিয়েও খুব বি

২।

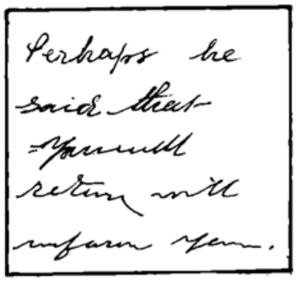


এরা বিশ্বস্ত নয়, কার
দায়িত্বজ্ঞানহীন। কিন্তু অ

৩।



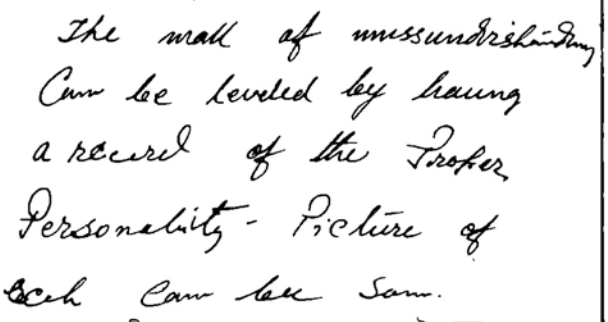
এদের হাতে কখনই অর্থসংক্রান্ত দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়। কারণ এরা অত্যন্ত অসৎ প্রকৃতির হয়।



৪। এই লেখার অধিকারীও দায়িত্বজ্ঞানহীন। কারণ এরা মানসিক, শারীরিক উভয় ক্ষেত্রেই অসুস্থ। তবে এরা অসৎ নয়।

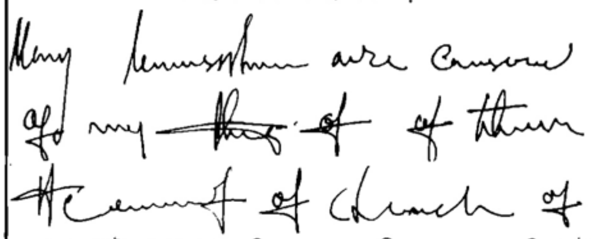
এবার 'মার্জিন' লক্ষ্য করুন। কোন একজন সুস্থ সুন্দর ব্যক্তির পক্ষে তাঁর লেখার 'মার্জিন'- টুকু অবশ্যই সুন্দর, পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। এখন দেখুন মার্জিনের বিভিন্ন অবস্থায় কেমন মানসিকতার তারতম্য হচ্ছে :

শুরুতে চওড়া, শেষে সরু



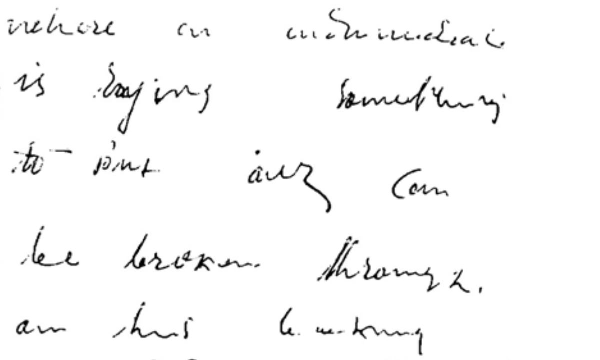
এরা সঞ্চয়ী মনোভাবের এবং সফলও হন ঐ ক্ষেত্রে

কখনো সরু কখনো চওড়া



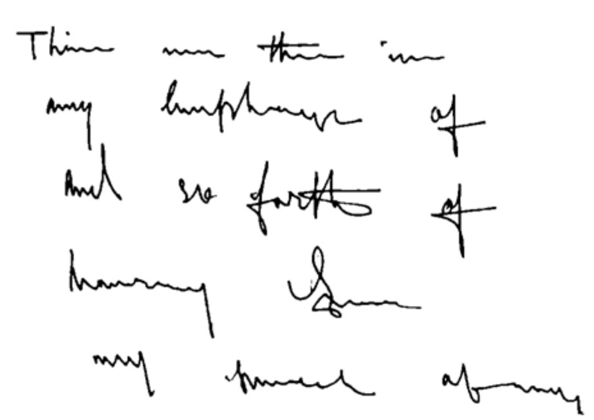
এরা খুবই প্রাণোচ্ছল। কিন্তু অসাবধানী এবং কোন বিষয়েই সুচিন্তিত পরিকল্পনা খাড়া করতে পারে না।

দুদিকেই সমান



এরা অত্যন্ত শিল্পী মনোভাবাপন্ন,সৌন্দর্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অতি তুচ্ছ বিষয়ের প্রতিও সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে।

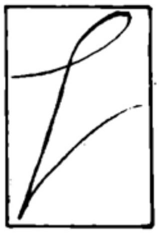
বাঁদিকে শুরুতে সরু শেষে চওড়া



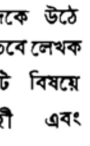
এরা অর্থ সঞ্চয় করতে ভালবাসে কিন্তু কী করে রাখতে হয় শুধু সেটাই জানে না।



এ ধরনের লেখা বই থেকে অথবা হাতের লেখা শেখানর স্কুল থেকে যেন শেখান হয়েছে। এরকম লোকেরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয় হয়। খাঁটি স্বভাবের নয়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় এবং এদের নিজেদের কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।



ছোট হাতের 'f' যদি এরকম লুপ তৈরি করে ডানদিকে উঠে যায় তবে লেখক প্রতিটি বিষয়ে আগ্রহী এবং অত্যন্ত করিতকর্মা হয়।



স্বাধীন এবং সদানন্দ চরিত্রের। যে কোন বিষয়ে গভীর চিন্তা করে।

যারা লেখে হাল্কাভাবে তারা অত্যন্ত মেজাজী, শান্তিপ্রিয় ও সাধারণভাবে থাকতে ভালবাসে।

আত্মসম্মানী ও দয়ালু চরিত্রের হয়। শরীর মোটামুটিভাবে ভালই। চওড়া বড়বড় এবং চাপ দিয়ে যারা লেখে তাদের আচার-ব্যবহার খুব খারাপ। উদ্ধত স্বভাবের, প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রচন্ড আছে।

অত্যন্ত চওড়া মোটা আর জড়ানো লেখা থেকে বোঝা যায় এরা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও পশু প্রকৃতির।

বড় হাতের প্রথম অক্ষরটি যদি অন্য অক্ষরগুলোর থেকে তিনগুণ বড় হয়, তবে বোঝা যায়, এরা অত্যন্ত অহঙ্কারী, আত্মাভিমানী ও আত্মগর্বে গর্বিত। যাদের বড় হাতের অক্ষর অতি সাধারণ, মনে হয় ছাপার অক্ষরের মত, তারা অত্যন্ত লজ্জাশীল, নিখুঁত চরিত্রের। এদের কালচারাল টেস্টও থাকে।

যদি বড় হাতের প্রথম অক্ষরটি খুব সাজান শৈল্পিক হয় তবে তারা খুব জাঁকজমক ভালবাসে। চিন্তাধারায় কোন গভীরতা নেই !

অপরাধ বিজ্ঞান ও ফরেনসিক বিভাগের একটা প্রধান শাখা হল হস্তলিপি বিশ্লেষণ। অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও দক্ষ হস্তলিপি বিশেষজ্ঞের অভাব নেই। অপরাধীদের লেখা কেমন হবে আমি তার কিছু নমুনা দিচ্ছি।

১। এদের প্রথম বড় হাতের অক্ষরটি মোটেই সুন্দর হয় না।

২। লেখাগুলো বাঁদিকে হেলান অথবা খাড়া হয়।

৩। ছোট হাতের অক্ষরগুলি বিভিন্ন সাইজের হয়।

৪। *M* এবং *N* অক্ষর দুটিকে *w* এবং *U* এরমত দেখতে হয়।

৫। বাঁদিকের মার্জিন কখনো লম্বা কখনো চওড়া।

৬। নিচের স্ট্রোকগুলি মোটা আর কদাকার।

৭। চিঠিপত্র বা অন্যান্য লেখাতে কল্পনাশক্তির অভাব এবং লেখা ছোট হয়।

৮। যে কোন 'ক্রস'- গুলি খুব মোটা।

আগের ঐ আটখানি লক্ষণ যদি কোন লেখার মধ্যে থাকে তবে বুঝবেন, এরা অত্যন্ত পশু প্রকৃতির, নৃশংস ও কামপরায়ণ হয়। এরা নিজের জন্য পারে না এমন কাজ নেই।

এবার দেখুন, সুরুচিসম্পন্না সুগৃহিণী হলে তাদের হাতের লেখা কেমন হবে :

১। গোল অথবা মিশ্র দুই

আকৃতির অক্ষরই হতে পারে।

২। বড় হাতের অক্ষর সাধারণ।

৩। 'p' এবং 'R'-এর পেট-গুলো মোটা হবে।

৪। 'g' এবং 'y' -এর এরকম ল্যুপ থাকবে।

৫। লেখা খাড়া অথবা ডানদিকে সামান্য হেলে থাকবে।

৬। 't' -এর ক্রস-গুলি মাঝারি সাইজের হবে।

৭। 'd' এবং 't' -এর ল্যুপ থাকবে।

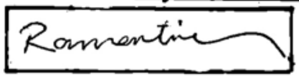
৮। পারিচ্ছন্ন এবং সর্বত্র সমান চাপের লেখা।

৯। একটু বড় অক্ষর, কিন্তু স্পেস বেশ সুন্দর।

১০। ধীর এবং সমান ছন্দ সর্বত্র।

স্বার্থপর, লোভী, নীচমনাদের লেখা চিনবেন এগুলো দেখে –

১। ছোট ছোট লেখা। ২। জড়ানো অক্ষর ৩। 't' এর ক্রস দুর্বল। ৪ শব্দের মাঝের ফাঁক কম এবং অনিয়মিত। ৫। বড় হাতের অক্ষর সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন। ৬। লেখার শেষের স্ট্রোক থাকে নিচে ডানদিকে অর্থাৎ এরকম –



এবার অভ্যাস করুন এইভাবে লেখার, যাতে আপনার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। আমি ক্রমান্বয়ে বৈশিষ্ট্যগুলো সাজিয়ে দিচ্ছি

১। সরলতা, আন্তরিকতা – সোজা লাইন হবে, ছোট হাতের সমস্ত অক্ষগুলো সমান হবে।

২। স্বতঃস্ফূর্ততা – নিচের স্ট্রোকগুলো সূক্ষ্ম হবে, উপরেরগুলো লম্বা হবে এবং ক্রস স্ট্রোকগুলো কখনও নামবে না।

৩। বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব – 'M', 'N' গুলো 'w' ও 'u'-এর মত দেখতে হবে।

৪। অপরের উপর আস্থাবান – সোজা লাইন এবং সমস্ত সোজা অক্ষর।

৫। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ – লম্বা, কঠিন 't' বার ল্যুপ অক্ষরগুলো অর্থাৎ 'g', 'y', 'f' ইত্যাদি অক্ষর-গুলো ল্যুপ না হয়ে স্ট্রোক হয়, অর্থাৎ এইরকম 'g' 'y' ও 'f'।

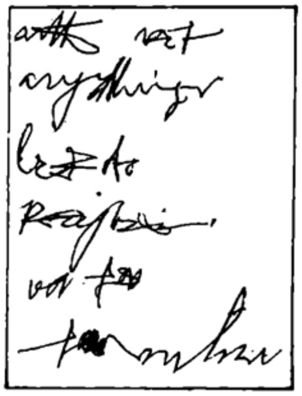
৬। মানিয়ে চলার ক্ষমতা – কৌণিক লেখা, এবড়োখেবড়ো 'বেস' লাইন নয়।

৭। আলাপী – নরম, দ্রুত লেখা, 'd' এবং 't' অক্ষরগুলোতে ল্যুপ থাকে।

৮। উদারতা – অক্ষর এবং শব্দ ও লাইনে সমান ছন্দ থাকে।

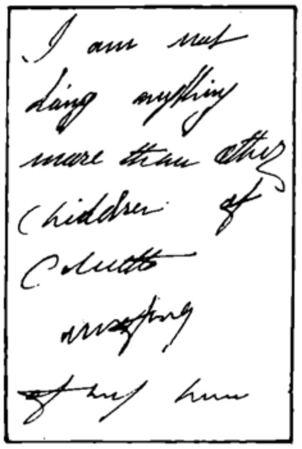
এবার দু-একটি মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে শেষ করব। মোটামুটি বললাম এজন্য যে, এ বিষয়টির এত সূক্ষ্ম এবং খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে যার সবকিছু এই স্বল্প পরিসরে দেখান সম্ভব নয়। তবু লিখলাম। যদি কেউ এ বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহী হন – এই ভেবে।

(ক)



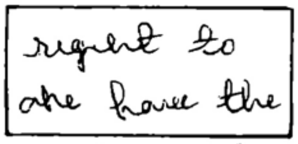
উপরের লেখাটি যদি উঠতি যৌবনের কোন ছেলের হয়, তবে তার পক্ষে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া সত্যিই খুব কষ্টকর ব্যাপার হচ্ছে।

(খ)



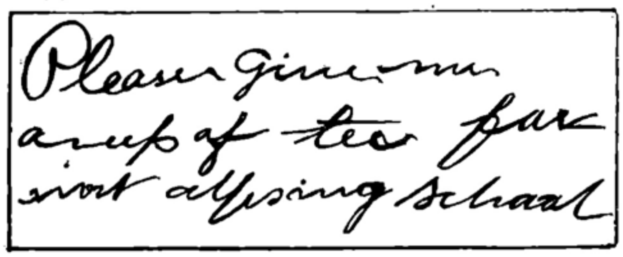
উপরের লেখাটি থেকে বোঝা যায়, লেখকের দৃষ্টিশক্তি-ঘটিত দুর্বলতা আছে এবং যার জন্য খুব তাড়াতাড়ি 'রিডিং' পড়তে পারেন না।

(গ)



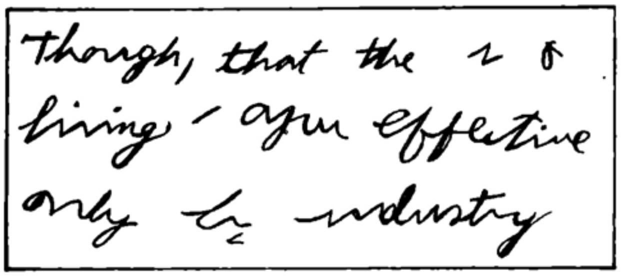
এ লেখাটি এক লাজুক বালকের।

(৫)

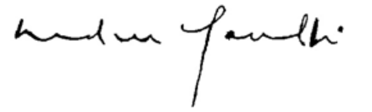


এই লেখাটি হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা নির্দেশ করে।

(৬)



উপরের লেখাটি থেকে বোঝা যায়, লেখক প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন।



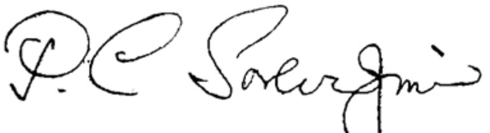
(**INDIRA GANDHI**)



(**ABRAHAM LINCOLN**)



(**ZAIL SINGH**)



(**P. C. SORCAR (JR.)**)

'সিগনেচার' থেকে জানতে পারবেন ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-চরিত্রকে। একাধিক বিখ্যাত লোকের সই-এর নমুনা দিলাম। এঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কতখানি প্রতিষ্ঠিত এবং মহৎ তা নিশ্চয় পাঠককে বলে দিতে হবে না। □

রমেন্দ্র নাথ নস্কর



ছবি : কল্যাণ চক্রবর্তী

হাতের চেটোয় মানুষ চিনুন

'আমার হাতের ডগায় বাস করেন লক্ষ্মী, মাঝখানে বাস করেন সরস্বতী, মূলে বাস করেন গোবিন্দ। প্রভাতে আমি আমার হাত দুটি দেখলাম। হে, পৃথিবী! তুমি সমুদ্রের বসন পড়েছ, পর্ব্বতমালা তোমার স্তন মন্ডল। তুমি বিষ্ণু পত্নী। প্রভাতে আমার পাদস্পর্শ ক্ষমা কর।'

হাত দেখানর বাতিক যাদের আছে এবং হাত-দেখিয়ে জ্যোতিষীদের কাছে এই শ্লোকের প্রথম দুই লাইনের ভূমিকা অসাধারণ ভাবে বেশি। কেউ কেউ সকালে হাত দেখানর প্রশস্ততা সম্পর্কে শাস্ত্রীয় প্রমাণ হিসাবে এই দুই লাইনের বাহুল ব্যবহার করে থাকেন। হাত দেখা শাস্ত্র, যার ভারতীয় নাম সামুদ্রিক শাস্ত্র, তার মূল কথাটা এই প্রথম দুই লাইনে সূত্রবন্ধ হয়ে আছে। হাতের তিনটে ভাগ রেয়েছে। (১) করমূল বা কব্জির দিককার অংশ। (২) করমধ্য বা চেটো। (৩) কর অগ্র বা আঙুল, কব্জির দিককার অংশটিতে গোবিন্দ বাস করেন। গোবিন্দ শব্দের অর্থ হল যিনি ইন্দ্রিয়ের পরিচালক। ইন্দ্রিয়াধীন মানুষের ইন্দ্রিয় সমূহের শক্তি বা মাত্রার হেরফের এই কব্জির অঞ্চলের শুভ অশুভের উপর নির্ভরশীল। কার হাতের কব্জির দিককার অংশটা মাংসল ও সুঠাম গড়নের হলে তার ইন্দ্রিয়গুলি সবল হবে। দৈহিকভাব ভাল থাকবে। ফলে সাধারণভাবে এই লোকগুলির দেহের পরিপোষণ ভাল হওয়ায় স্বাস্থ্য বিষয়ে সুখ ভোগ হয়। চিমরে বা মাংসলতার ভাব কম থাকলে বা গড়নের ভাবটা যদি সুঠাম না হয় তবে বুঝতে হবে তার ইন্দ্রিয়জ দুর্বলতা থাকবে। এবং এই দুর্বলতাজনিত অস্বাস্থ্যতা তাকে কষ্ট দেবে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের এমন থাকলে ব্যায়ামাদি যোগাসন দ্বারা ছোট বয়স থেকেই শিশুদের স্বাস্থ্য চর্চা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ভাল। বড়রা ব্যায়ামাদি দ্বারা নিজেদের সংশোধন করতে পারেন। সামুদ্রিক শাস্ত্র বা হাত-দেখা বিদ্যার এই খানকার রেখার বৈচিত্র ও পরিমাপ থেকে মানুষের আয়ুর পরিমাপের হিসেব তাই নির্দিষ্ট করেছে।

আমরা দু'রকমের চেটো ও দু'রকমের আঙুল সাধারণতঃ দেখে থাকি। কারো চেটো চওড়া ধাঁচের ছোট মতন, কারো বা লম্বাটে ধাঁচের। আঙুলের ক্ষেত্রেও তাই। কারো বেঁটে ছোট ধাঁচের কারো বা লম্বাটে ঢং'এর। হাতটা উল্টে দেখলে এই ভাব বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

চেটোর দু'টো ধাঁচ ও আঙুলের দু'টো ঢং নিয়ে চার রকম হাতওয়ালা মানুষ স্বাভাবিক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এই চার ধাঁচের মানুষে নানা গুণভেদ আছে। সামুদ্রিকের জটিল নিয়ম কানুনে তা ধরার পদ্ধতিও রয়েছে। এখানে জটিলতা-বর্জিত স্বাভাবিক চার ধাঁচের আলোচনা রইল। অভিভাবকদের এটা জানা থাকলে তিনি তাঁর প্রিয় শিশুকে সঠিকভাবে যেমন বুঝতে পারবেন তেমনি তাকে সাবলীল রাস্তায়

রেখে পরিচালিত করতেও সুযোগ পাবেন। চেটো ও আঙুল নিয়ে যে চারটি গঠনগত ধারা তা হ'ল

১। চওড়া বা বেঁটে চেটোয় লম্বাটে আঙুল।

২। চওড়া বা বেঁটে চেটোয় বেঁটে বা ছোট ধাঁচের আঙুল।

৩। লম্বাটে চেটোয় বেঁটে বা ছোট ধাঁচের আঙুল।

৪। লম্বাটে চেটোয় লম্বাটে আঙুল।

এই চার রকম ধাঁচের প্রথমটি অর্থাৎ চওড়া চেটোর বা কিছুটা বেঁটে ঢং এর চেটোয় লম্বাটে আঙুল বসান হাতের মানুষদের বুদ্ধি বেশি থাকে। এমন হাত-যুক্ত মানুষেরা চটপটে, সকল কাজে বুদ্ধি ও কৌশলের উপরই বেশি নির্ভর করে। কোন বিষয়কে এরা যেমন তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে তেমনি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার প্রবণতাও এদের থাকে। দীর্ঘস্থায়ী বা একনাগাড়ে কাজে এদের প্রায়শই অনীহা থাকে। এবং সবসময় একটি বর্হিমুখী ভাবনায় উদ্বেলিত থাকে। ফলে নানা বিষয়ে মাথা গলানর দোষ এদের থাকে। এবং প্রায়ক্ষেত্রেই এদের চিন্তা ভাবনায় একাগ্রতার অভাবের জন্য বাস্তব জীবনে কষ্ট এসে পড়ে। দোমনা মানসিকতাই এদের প্রধান দোষ। আদর্শ বা উচ্চ মানসিকতা এদের আছে। স্বার্থবুদ্ধি কখনোই অন্যের প্রতি অসহানুভূতিহীন অবস্থায় থাকে না। এই শ্রেণীর হাতের মানুষদের স্বাভাবিক বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভতার সংগে মানসিক একাগ্রতা ও ধৈর্যের সংযোগ ঘটলে-এরা সমাজে সফল ও প্রিয় মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে এদের ধারণার অনেকটাই বুদ্ধি ও বিচারের উপর নির্ভশীল। শিশুদের এমন হাতের কাঠামোয় অভিভাবকরা শিশুটির চাঞ্চল্য কমান বা মানসিক একাগ্রতা বাড়াবার চেষ্টা করবেন। শারীরিক ক্ষেত্রে এমন হাতের মানুষেরা, বায়ু প্রকোপ, স্নায়ু বিকার বা কফের প্রাবল্যে বেশি ভোগেন।

চওড়া বা বেঁটে চেটোয় বেঁটে বা ছোট আঙুল বসান হাতের মানুষটির মানসিকতার বৈষয়িক ভাবনা বেশি। এমন হাতের মানুষেরা ধীরতা ও স্থিরতার সংগে নিজের ভালটা করায়ত্ত করার চেষ্টা করে। এদের মানসিক উদারতা অনেকটা দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ককে ঘিরেই গড়ে উঠে। এদের দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য-বোধ স্বার্থবাহী কারণ-গুলোকেই আঁকড়ে থাকে। যেখানে স্বার্থ নেই সেখানে দায়িত্ব ও কর্তব্য এদের কাছে মূল্যহীন। কাজ কর্মের দিকে স্বকীয় চিন্তাভাবনা যথেষ্ট না থাকলেও বাঁধাধরা নিয়মে বা অন্যের দ্বারা এরা পরিচালিত হয়ে অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সাহায্যে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে। এমন হাতের শিশুদের ছোট বয়স থেকেই যুক্তিশীল, সহনশীল করে গড়ে তোলা উচিত। এমন হাতের মানুষের দীর্ঘস্থায়ী রোগ-ভোগের প্রবণতা বেশি, ছোট-খাট রোগ তেমন হয়ই না। বাত, পেশী বেদনা ইত্যাদিতে ভোগার প্রাবল্যতা বেশি।

লম্বাটে ধরনের চেটোয় বেঁটে ছোট ধাঁচের আঙুল বসান মানুষের হাতের মানসিক বৈশিষ্ট্য হ'ল। এদের চিন্তার ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব ভংগী থাকে। চিন্তার স্বাধীনতায় নিজস্ব ধারায় চলার প্রবণতা এই হাতের ঢং'এর মানুষদের মধ্যে বর্তমান থাকে যেমন, তেমনিই অন্যকেও নিজের মতে পরিচালিত করার ইচ্ছা থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে এরা যেমন নিজের স্বকীয়তা ফুটিয়ে তুলতে পারে, তেমনি নিজের গুণাবলী দিয়ে অন্যের উপকারও করে। যে কোন জিনিসের বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এমন হাতের মানুষের রয়েছে। ফলে নিত্য নতুনকে জানার আগ্রহ যেমন এদের বেশি তেমনি অনুসন্ধান প্রবৃত্তিও অন্য মানুষের থেকে বেশি। নিজের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়নের ক্ষমতা এমন হাতের মানুষদের থাকে। যুক্তিবাদী ও উদার মনোভাবের মানসিকতা এদের মধ্যে কম বেশি রয়েছে। ফলে এই মানুষেরা সমাজে দায়িত্বশীল, কাজের মানুষ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কাজ কর্মের পরিধিতে স্বাধীনভাবে কাজ করতেই ভাল বাসে। এবং অনুকূল পরিবেশে নিজের স্বাধীন চিন্তার দৌলতে নিত্য নতুনের আগমন ঘটিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিতে পারে। এমন হাতের খারাপ দিক হ'ল নিজস্ব চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে যুক্তি ও জ্ঞানগত বিশ্লেষণের অভাব। ফলে একগুঁয়েমি, মিথ্যা অভিমান বোধ, অনুদারতা প্রভৃতি এদের ঘিরে ফেলে। শিশুদের এমন হাতের হদিস পেলেই অভিভাবকরা উপযুক্ত সময়েই সর্তক হবেন। শারীরিক ক্ষেত্রে এমন হাতের লোকেরা জ্বর, পিত্ত প্রকোপ ও প্রদাহ-জনিত রোগে কষ্ট পেয়ে থাকে।

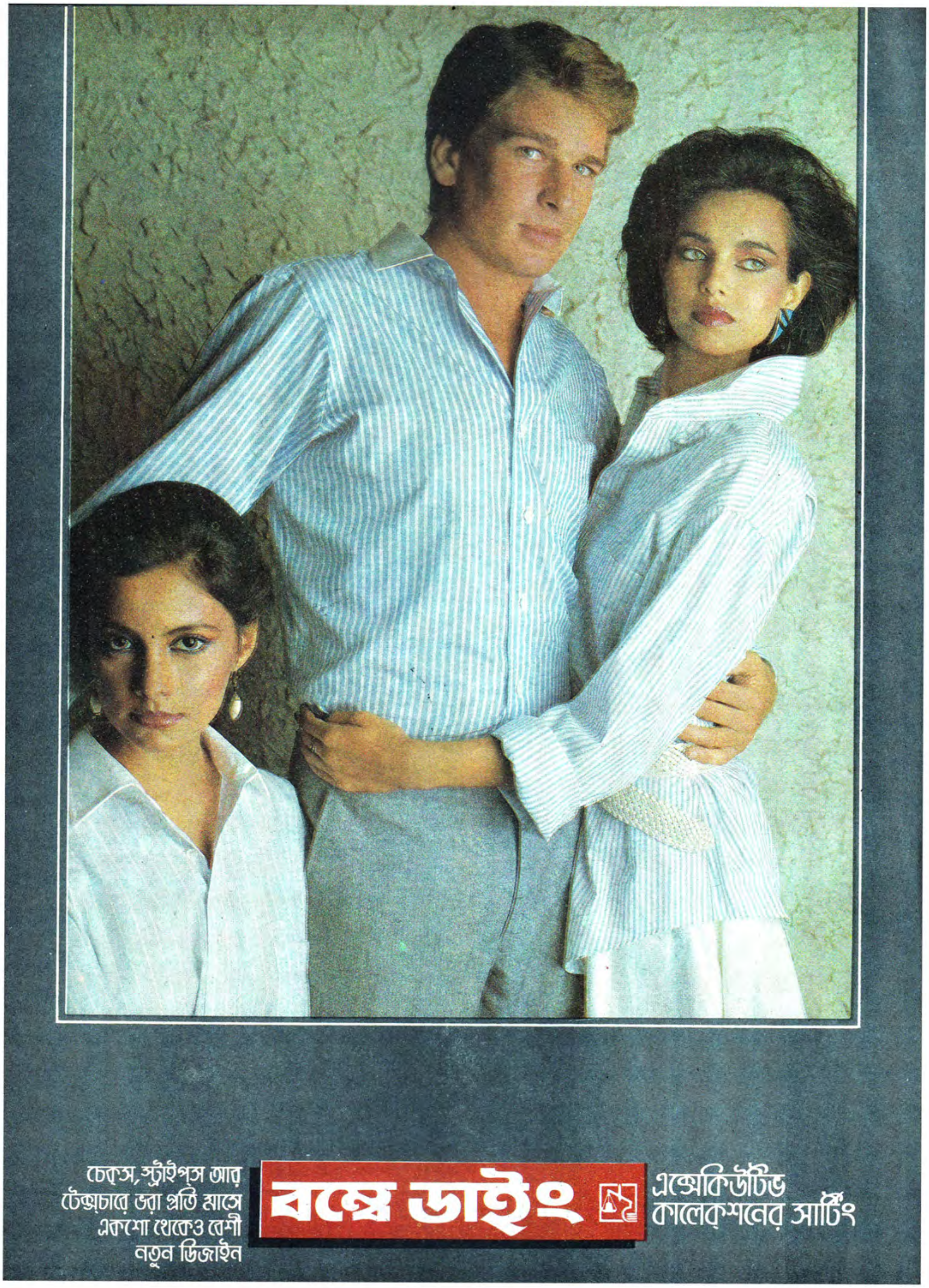
আবেগ, উচ্ছ্বাস, অভিমান ও কল্পনাময় ভাবুক হাত হল, লম্বাটে চেটোয় লম্বাটে আঙুল বসান হাতের ঢংটি। এমন হাতের মানুষেরা বেশি মাত্রায় সংবেদনশীল হওয়ায় এদের জীবন-যাত্রায় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব বেশি মাত্রায় কাজ করে। এবং জীবনের গতিধারায় বাস্তবতা থেকে অবাস্তব চিন্তাভাবনার প্রভাব বেশি দেখা যায়। কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে এদের স্বকীয়তার ভাবনা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাধা বিপত্তির মুখে দৃঢ়তা দেখাতে পারে না। বাধা-বিপত্তিহীন অনুকূল পরিবেশ এরা সুন্দর দক্ষতার পরিচয় যেমন দিতে পারে, তেমনি নতুন নতুন ভাবনা ও চিন্তার সম্ভাবনাকেও জাগিয়ে তুলতে পারে।

দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকটা আবেগ, উচ্ছ্বাস, রাগ, বিরাগ অনুযায়ীই হয়ে থাকে বা মানসিক ভাবালুতা দ্বারা পরিচালিত হয়। এমন হাতের ঢং যে সমস্ত শিশুদের রয়েছে তাদের অভিভাবকদের শিশুদের পরিচালনের ক্ষেত্রে সতর্ক ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে শিশুর থাকার পরিবেশও সাথী নির্বাচনের দিকটিতে লক্ষ্য রাখা দরকার। এমন হাতের মানুষদের ঠাণ্ডালাগা, সর্দি-কাশি, শ্বাসযন্ত্র ও রক্তসংবহন সংক্রান্ত রোগ ভোগের প্রবণতা বেশি থাকে। □

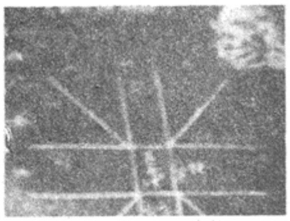

রাস্তায় বসে জ্যোতিষ-গণনা / ফটো : জয়ন্ত চৌধুরী


রত্ন ধারণ করেও চিন্তিত ? ফটো : অরুণ চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ রণতোষ সাহা


চেক্‌স, স্ট্রাইপ্‌স আর
টেক্সচারে ভরা প্রতি মাসে
একশো থেকেও বেশী
নতুন ডিজাইন
বম্বে ডাইং
এক্সেকিউটিভ
কালেক্‌শনের সার্টিং

ইংলণ্ডের জ্যোতিষ আর আমাদের জ্যোতিষ



ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে এক আশ্চর্য বৈচিত্র্য, রয়েছে এক অন্য স্বাদ যা পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। আমাদের মানসিক চিন্তাধারা, শিক্ষা ব্যবস্থা, রীতিনীতি সব কিছুই ইংলণ্ডের চিন্তাধারার সঙ্গে আলাদা। আলাদা জ্যোতিষিক গণনা পদ্ধতিও। এই প্রবন্ধে তার কিছু আভাস দেব।

আমরা নয়টি গ্রহ যথাক্রমে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুর ওপর বিচার করি। ইংলণ্ডে রাহু ও কেতুর কোন স্থান নেই। তাঁরা ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর প্রভাবকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষে ইউরেনাস গ্রহের ভূমিকা অনস্বীকার্য, গ্রিক পুরাণে আছে শনির পিতা হল ইউরেনাস। শনি চক্রান্ত করে পিতাকে রাজ্যচ্যুত করে ও ইউরেনাস পাতালে আশ্রয় নেয়।

উইলিয়ম হার্সেল সাহেব ১৭৮১ খৃস্টাব্দে ইউরেনাসকে আবিষ্কার করেন তাই অনেকে এর নাম দিয়েছেন হার্সেল আকস্মিক কোন ঘটনা, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎশক্তি, বিস্ফোরণ, জ্যোতিষ জ্ঞানের প্রকাশ, হঠাৎ করে প্রাপ্তিযোগ ইউরেনাস দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে বলে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদেরা মনে করেন।

নেপচুন গ্রহটি ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে ইউরোপে প্রথম আবিষ্কার হয়। গ্রিক জলদেবতা নেপচুনের নাম অনুযায়ী গ্রহটির নাম নেপচুন রাখা হয়। ওখানকার জ্যোতির্বিদরা মনে করেন যে, জীবনের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের মূলে নেপচুনের ভূমিকা বেশি। নেপচুন রাশিচক্রে শুভ অবস্থায় থাকলে মানসিকতা উদার হয়। নেপচুন ও শুভ শুক্রের যোগাযোগে সুদক্ষ অভিনেতা, শিল্পী ও গুণীজনের জন্ম হয়।

প্লুটোকে দুর্যোগ, ধ্বংস, মৃত্যুকারক বলা হয়েছে। গ্রিক পুরাণে বলা হয় প্লুটো পাতাল রাজ্যের রাজা, নাম হেডেস। প্লুটো রাশিচক্রে দুর্বল হলে দুর্যোগ, আকস্মিক মৃত্যু প্রভৃতি হবার সম্ভাবনা।

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে যে সব বিষয়ে ব্যাপকতা আছে ইংলণ্ডে কিন্তু তেমন নয়। যেমন,

১। ইংলণ্ডে চন্দ্র থেকে জন্মরাশি বিচার হয় না।

২। নক্ষত্র বা দশাবিচার তারা করেন না।

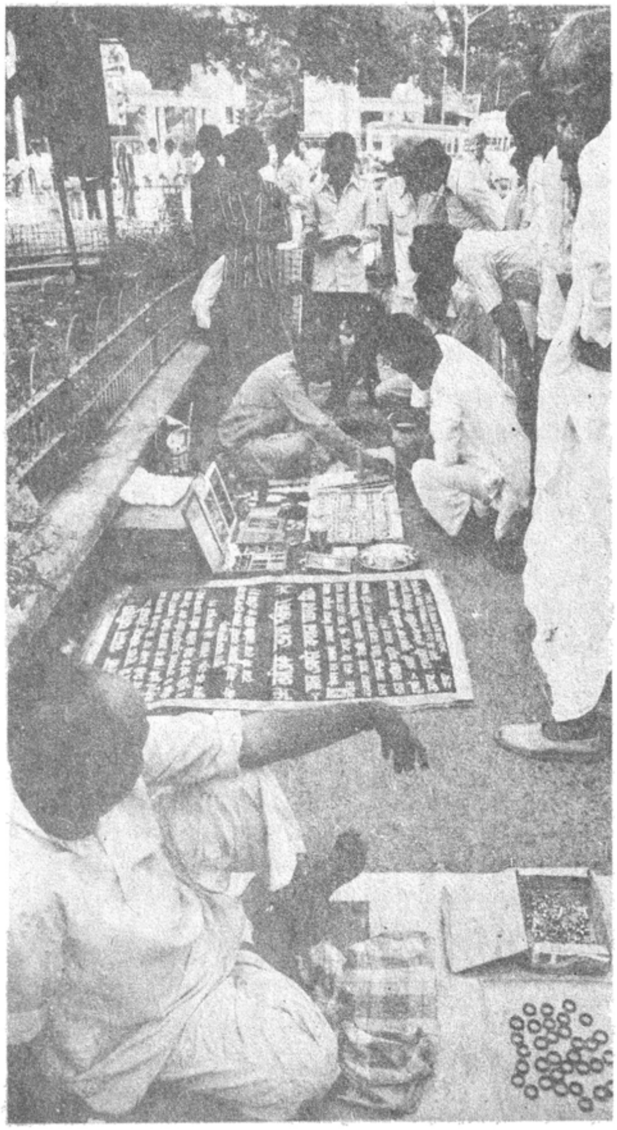
৩। নবাংশ, ত্রিশাংশ বা দশাংশ বিচার নেই।

ওদের প্রধান ভিত্তি হল সূর্য বা রবি গ্রহ (The Planet Sun)।

এটা বোধহয় সবারই জানা যে, বারটি রাশি নিয়ে রাশিচক্র। রাশিচক্রকে ইংরাজিতে বলা হয় The Sign of the zodiac.

সূর্য প্রতি রাশিতে এক মাস অবস্থান করে। সমগ্র রাশিচক্রকে পরিভ্রমণ করে সূর্যের একবছর সময় লাগে। ওদের মতে সূর্য যখন যে রাশিতে থাকে সেই সময় কেউ জন্মগ্রহণ করলে সেই রাশি জাতক হয়।

রবিগ্রহ ২১ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল মেষে অবস্থান করে।
রবিগ্রহ ২১ এপ্রিল থেকে ২১ মে বৃষে অবস্থান করে।
রবিগ্রহ ২২ মে থেকে ২১ জুন মিথুনে অবস্থান করে।
রবিগ্রহ ২২ জুন থেকে ২৩ জুলাই কর্কটে অবস্থান করে।
রবিগ্রহ ২৪ জুলাই থেকে ২৩ আগস্ট সিংহে অবস্থান করে।
রবিগ্রহ ২৪ আগস্ট থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর কন্যাতে অবস্থান করে।
রবিগ্রহ ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ অক্টোবর তুলায় অবস্থান করে।
রবিগ্রহ ২৪ অক্টোবর থেকে ২২ নভেম্বর বৃশ্চিকে অবস্থান করে।
রবিগ্রহ ২৩ নভেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর ধনুতে অবস্থান করে।
রবিগ্রহ ২২ ডিসেম্বর থেকে ২০ জানুয়ারি মকরে অবস্থান করে।
রবিগ্রহ ২১ জানুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি কুম্ভে অবস্থান করে।
রবিগ্রহ ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ মার্চ মীনে অবস্থান করে।



ভাগ্য দেখাতে ভীড় / ফটো : জয়ন্ত চৌধুরী



আঙুলে মাদুলি ধারণ করেছেন বহু

বর্তমানে ভারতবর্ষের ইংরেজি পত্র-পত্রিকাতেও জন্ম তারিখের ভিত্তিতে রাশিচক্র লেখা হয়। তবে প্রকৃত রাশি বলতে কিন্তু অন্য কিছু বোঝায়। ভারতীয় মতে জন্মপত্রিকায় যে রাশির গৃহে 'চ' লেখা থাকে সেই রাশিই আপনার জন্মরাশি। আমরা লিখি চন্দ্রের ভিত্তিতে ওরা লেখে সূর্যের বা ইংরেজি তারিখ অনুযায়ী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইংলণ্ডে যে ভাবে গণনা করে বিদেশের অধিকাংশ জায়গাতেই গণনা পদ্ধতি মোটামুটি একই রকমের। তবে বর্তমানে আমেরিকার জ্যোতির্বিদরা আমাদের মত রাহু কেতুর প্রভাবকে মেনে নিয়েছে।

বিবাহের ব্যাপারে আমাদের ও পাশ্চাত্যের আদর্শে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ওরা বিবাহের ব্যাপারে সপ্তমে মঙ্গল ও শুক্রের সপ্তমে অবস্থানকে আদর্শ যোগ বলেছে, অথচ আমরা এই যোগ সপ্তমে থাকলে বিবাহিত জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশের ফলে খারাপ হবে বলে চিন্তা করি। □

ডঃ সন্দীপন চৌধুরী

ফটো : পার্থ রায়চৌধুরী

গনি খান মনে করেন না তাঁর দপ্তর কম গুরুত্বপূর্ণ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আবার ফিরে এলেন বরকত গনি খান চৌধুরী। সেই সঙ্গে নতুন মন্ত্রী হলেন অজিত-কুমার পাঁজা। শ্রীমতী গান্ধীর সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে মন্ত্রী ছিলেন দুজন। রাজীব নিলেন তিন-জনকে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় উপেক্ষিত, একথা আর কেউ বলতে পারবেন না, কিন্তু এই দুজন মন্ত্রীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আসার পিছনের কাহিনী কী? পরিবর্তন-এর দিল্লি প্রতিনিধি সুজিত রায় সে সম্পর্কে লিখেছেন। সেই সঙ্গে নিয়েছেন এই দুই নবনিযুক্ত মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার। বরকত গনি খান চৌধুরী মনে করেন না, তাঁর দপ্তর কম গুরুত্বপূর্ণ।



ছবি ঃ গনি খান চৌধুরী

'কাজ করব সব রাজ্যের জন্যই'—গনি খান চৌধুরী

২৫ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই সারা দিল্লিতে হৈ চৈ। 'ম্যাসিভ রিশাফল' হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার। অনেকে গেছেন, অনেকে এসেছেন। খবরের পর খবর। কিন্তু সব খবর ছাপিয়ে যে খবরটি সবার কাছে একদিকে বিস্ময়, অন্যদিকে আনন্দের সাড়া জাগিয়েছিল, তা হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ক্যাবিনেট সদস্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা সদস্য আবু বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরীর পুনর্নিয়োগ।

কয়েকদিন আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল পাঞ্জাবে নির্বাচনী সফর সেরে ফিরে এসেই রাজীব গান্ধী মন্ত্রিসভার রদবদল ঘটাবেন। গনি খান চৌধুরী যে আবার ফিরে আসছেন সে রকম খবরও হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল কিন্তু সত্যিই যে তা হবে, এটা কেউ সহজে বিশ্বাস করেনি।

দীর্ঘদিন ইন্দিরা গান্ধীর আমলে প্রথমে শক্তি দপ্তরের এবং তারপরে রেলমন্ত্রী হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করার পরও শ্রীচৌধুরীর রাজীব গান্ধীর প্রথম মন্ত্রিসভায় ঠাঁই হয়নি। অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি এবং রেলমন্ত্রী এ বি এ গনি খান চৌধুরীকে সেদিন প্রধানমন্ত্রী সরাসরি জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'আপনাদের আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রাখতে পারছি না।'

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেদিন হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একমাত্র শিবরাত্রির সলতে নিভু নিভু হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এতদিন জ্বলছিলেন অশোক সেন আইনমন্ত্রী হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গের আর কেউই ছিলেন না।

বরকত গনি খান চৌধুরী অবশ্য পরে কংগ্রেস দলের সাধারণ সচিব হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী তাতে খুশি হননি। রেলমন্ত্রী হবার পর থেকেই গনি খান চৌধুরী সারা ভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রেল ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখেছিলেন সে কথা মানুষ ভোলেনি।

আজ মানুষের আশা পূরণের পথ খুলে গেল আবার। শুধু কেন্দ্রীয় পূর্ণমন্ত্রীই নয়, দায়িত্ব পেয়েছেন সম্পূর্ণ নতুন 'প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন' দপ্তরের, যে দপ্তরটির সৃষ্টি এই প্রথম এবং যা একমাত্র রাজীব গান্ধীরই মস্তিষ্ক-সঞ্জাত।

২৫ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় যখন শ্রীচৌধুরীর ১২ আকবর রোডের বাংলোয় পৌঁছলাম, তখন সেখানে রীতিমত ফুর্তির জোয়ার বইছে শ্রীচৌধুরীর ব্যক্তিগত সচিব সাধন মণ্ডল বললেন, 'আমি সত্যিই এখনও টেনশন কাটিয়ে উঠতে পারিনি।'

টেনশন কাটিয়ে উঠতে পারেননি আরও অনেকেই। নানক সিং, অতুল দাস, পরিতোষ পাত্র এমন অনেকেই—শ্রীচৌধুরীর সঙ্গে যাঁদের নিত্য ওঠা বসা।

সেদিন শ্রীচৌধুরীর দেখা মেলেনি। ব্যস্ত ছিলেন প্রশাসনিক নানা কাজে। পরদিন দেখা করলাম। অভিনন্দন জানালাম। বললাম—দীর্ঘ ছুটির পর আবার ব্যস্ততার যুগে ফিরে এলেন। আমরা সবাই খুশি। আপনার মনের অবস্থা একটু জানতে চাই।

শ্রীচৌধুরী বেশি কথা বলেন না। তবে যা বলেন সাফ সাফ। মুখচোখ দেখে বোঝা মুশকিল সত্যিই কতখানি খুশি হয়েছেন তিনি। বললেন—দেখুন মন্ত্রী হয়েছি বলে যে খুব বেশি আনন্দিত তা নয়। আমি খুশি এই জন্য যে আগের মত এবারেও আমি একটা 'চ্যালেঞ্জিং' দপ্তরের ভার পেয়েছি। এর আগে কাজ করেছি 'এনার্জি' দপ্তরে। শ্রীমতী গান্ধী আমাকে রেলমন্ত্রী পদে বসালেন সেখান থেকে সরিয়ে এনে। সেটাও ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এবারে পরশুদিন রাত দশটায় প্রধানমন্ত্রী

রাজীব গান্ধী আমায় ডেকে জানালেন—'I am giving you a challenging job।' আমাকে ভার দেওয়া হল 'প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন' দপ্তরের। এটা একেবারে নতুন চিন্তাধারা উদ্ভূত দপ্তর। Naturally its a challenge to me to discharge my duties successfully to this newly created ministry.

পরিবর্তন : 'প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন' বা প্রকল্প রূপায়ণ নতুন দপ্তর এই দপ্তরের মূল কাজ কী হবে?

শ্রীচৌধুরী : এই দপ্তর সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করা, to bring speed into the works. প্রত্যেক রাজ্যেই বেশ কিছু প্রকল্প নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। কিন্তু নানা কারণে দেখা গেছে সে প্রকল্পগুলি শেষ হতে দেরি হচ্ছে। কিংবা মাঝপথে থেমে গেছে। আমার দপ্তরের মূল কাজ হবে সেই প্রকল্পগুলি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করা। যেমন ধরুন, কলকাতা মেট্রো রেলের কথা। কাজ শুরু হয়েছে সেই কবে। তখন খরচ ধরা হয়েছিল ১২৫ কোটি টাকা। শুধুমাত্র কাজে দেরি হওয়ার জন্য আজকে সেই খরচ দাঁড়িয়েছে ১৫০০ কোটি টাকায় ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের কাজ কিছুই এগোয়নি অথচ আজ থেকে ছমাস আগেই একটা ইউনিট অন্তত শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এগুলো কেন হচ্ছে, কী তার কারণ, এগুলি সার্ভে করে দেখে তার সমাধান সূত্র সহ প্রধানমন্ত্রীকে জানাতে হবে আমাকে তারপর উনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে যথাযথ নির্দেশ দেবেন।

পরিবর্তন : আপনার হাতে নতুন প্রকল্প শুরু করার মত কোন ক্ষমতা থাকবে কি

শ্রীচৌধুরী : ঠিক শুরু করার ক্ষমতা আমার দপ্তরের নেই। তবে আমরা যদি বুঝি যে কোন রাজ্যে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত বা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেখানে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুপারিশের জন্য পাঠাতে পারি। শুধু তাই নয়, কোন চলতি প্রকল্প থেকে বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশও আমার দপ্তর করার অধিকারী।

পরিবর্তন : নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রধানত কোন কোন দিকে আপনি মূলত নজর রাখবেন?

শ্রীচৌধুরী : ২০ দফা কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্যই এই দপ্তর। সুতরাং কোন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করার সময় চোখ কান খোলা রাখতে হবে চারদিকেই। এর মধ্যে অন্যতম বেকার সমস্যার সমাধান। জায়গার গুরুত্ব অনুযায়ী কোন রাজ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে যাতে শিক্ষিত এবং দক্ষ যুবকদের চাকরির সুযোগ ঘটে সেদিকেও নজর রাখব। অর্থাৎ একটা প্রকল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা। আগে এরকম কোন দপ্তর ছিল না। তখন 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার কমিটি'র মিটিং হত। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। এখন বলা যায় সেই ব্যবস্থাকেই আরও সম্প্রসারিত করা হল 'প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন' দপ্তর গঠনের মধ্য দিয়ে।

পরিবর্তন : রাজ্যে রাজ্যে এমন অনেক প্রকল্প টাকার অভাবে বাতিল হয়ে গেছে, যেগুলো অন্তত সেই সমস্ত রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ছিল। সেগুলোকে রিভাইভ করার কোন ক্ষমতা কি আপনার দপ্তরের থাকবে?

শ্রীচৌধুরী : আমি সেগুলোর গুরুত্ব বুঝে সার্ভে করে সুপারিশ করতে পারি।

পরিবর্তন : তাহলে পশ্চিমবঙ্গবাসী আশা রাখতে পারেন যে বাতিল রেলওয়ে প্রকল্প বজবজ-নামখানা কিংবা তমলুক-দীঘা রেলপথের কাজ আবার শুরু হতে পারে।

শ্রীচৌধুরী : শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, যে কোন রাজ্যেই বাতিল প্রকল্পের কাজ আবার শুরু হতে পারে।

পরিবর্তন : পশ্চিমবঙ্গের জন্য আপনি এক সময়ে এত কাজ করেছেন যে, 'পশ্চিমবঙ্গের নয়া রূপকার' হিসেবেও কোন কোন মহল থেকে আপনাকে অভিহিত করা হয়েছে। আপনি ফিরে আসায় সবাই খুশি। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের দিকে আপনার দৃষ্টি আগের মতই থাকবে এটা আশা



ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমকটিকে!
सुपर
रिन
सफ़ेदी की चमकार
সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক...
অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী!
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

রাখা যায় নিশ্চয়!

শ্রীচৌধুরী: পশ্চিমবঙ্গের জন্য কাজ তো নিশ্চয়ই করব। আগেও করেছি। এখনও করব—কিন্তু অন্য কোন রাজ্যকে এক্সপ্লয়েট করব না তার জন্য। সব রাজ্যই আমার কাছে সমান, তবে উন্নয়নের গুরুত্ব অনুসারে। একটা কথা কী জানেন, কাজ করার জন্যই আমরা। কাজ না করার জন্যই সরকারের পতন ঘটে। কোন বৈষম্যের ব্যাপার নয়। মূল কথা হল কাজ।

পরিবর্তন: যে সমস্ত রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার রয়েছে, সেই সমস্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রায়শই শোনা যায় কেন্দ্রীয় সরকার সেই রাজ্যকে অবহেলা করছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে। এমনও দেখা গেছে যে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরার জন্যই অনেক প্রকল্প শেষ হতে বা শুরু হতে দেরি হয়। মেট্রো রেল নিয়ে তো আপনি নিজেও ভুক্তভোগী। এরকম ক্ষেত্রে 'প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন' দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে আপনি কীভাবে সমস্যার সমাধান করবেন?

শ্রীচৌধুরী: হ্যাঁ, এটা একটা মস্ত বড় সমস্যা। তবে অকংগ্রেসী সরকার বলেই তাদের অবহেলা করা হচ্ছে এ অভিযোগ অন্যায়। প্রয়োজন থাকলে কাজ নিশ্চয়ই হবে। তা সে যে কোন দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন।

গনি খান চৌধুরী কাজের মানুষ। তিনি কাজ করতে চান। আমায় সাক্ষাৎকার দেবার মাঝেই উপস্থিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দপ্তরের জনৈক কর্মকর্তা। নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতেই শ্রীচৌধুরী তাঁকে নির্দেশ দিলেন, কলকাতার মেট্রো রেল, ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশন, বাঁকুড়ার পাওয়ার প্রোজেক্ট, চুখা হাইডেল পাওয়ার প্রোজেক্ট এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য রাজ্যেরও কিছু কিছু প্রকল্প জরুরি ভিত্তিতে শুরু করার জন্য।

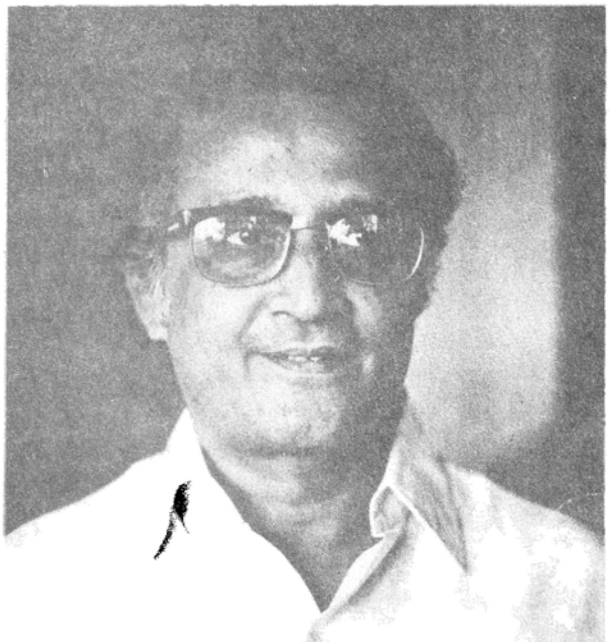
শুধু প্রকল্প রূপায়ণই নয়। ২০ দফা কর্মসূচির আওতাভুক্ত দারিদ্র্য-দূরীকরণ পরিকল্পনার উন্নয়ন নিয়েও শ্রীচৌধুরী চিন্তা-ভাবনা করছেন। তাছাড়া ভাবছেন 'পাবলিক সেক্টরে' সফল প্রাইভেট সেক্টরের মতই কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করার জন্যও।

সব মিলিয়ে আবু বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরী এখন ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। শেষ প্রশ্ন হিসেবে জিজ্ঞাসা করলাম—অবহেলিত উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে কিছু ভেবেছেন

শ্রীচৌধুরী বললেন—সত্যিই উত্তরবঙ্গ ভীষণভাবে অবহেলিত। আমি কথা দিচ্ছি, আমার সাধ্যমত উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য সাহায্যের হাত এগিয়ে দেব সব সময়েই। □

২৭.৯.৮৫

'এটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ'—অজিত পাঁজা



২৫ সেপ্টেম্বরের বিকেলে যখন অজিত পাঁজার ১৮ উইণ্ডসর প্লেসের বাংলোয় পৌঁছলাম, তখন সেখানে চাপা উৎসবের ঢেউ। শ্রীপাঁজা তখনও আসেননি। জরুরি কাজে ব্যস্ত রয়েছেন সকাল থেকেই। কখনও রাষ্ট্রপতি ভবনে, কখনও প্রধানমন্ত্রীর অফিস সাউথ ব্লকে, কখনও বা তাঁর নয়া দপ্তর যোজনা ভবনে

পৌঁছতেই অভ্যর্থনা করে বসালেন অজিত পাঁজার ব্যক্তিগত সচিব নির্মলবাবু নির্মল ভট্টাচার্য। বললেন একটু বসুন। উনি এখুনি আসবেন

ইতিমধ্যে ভিড় জমতে শুরু করেছে সাংবাদিকদের। বিশেষ করে কলকাতার দৈনিক পত্রিকাগুলির সাংবাদিকরা। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এতবড় সুসংবাদ—তাই সবাই ভিড় জমিয়েছেন শ্রীপাঁজার সঙ্গে কথা বলতে

প্রতি দু মিনিট অন্তর তখন ফোন বেজে চলেছে। কখনও অভিনন্দন বার্তা, কখনও বা আবেদন—'সাক্ষাৎকার চাই', 'ফটো তুলতে চাই' নির্মলবাবু সবাইকে চারটের সময় চলে আসতে বলছেন। ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, 'আর বলবেন না মশাই। সকাল থেকে কত যে ফোন যে এল বলবার কথা নয় বললাম—'খুব স্বাভাবিক!'—হ্যাঁ, তা তো বটেই। আমার তো এখনও যেন কেমন সব স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে

কথার মাঝেই শ্রীপাঁজা হাজির। সঙ্গে সলিসিটর জেনারেল। এগিয়ে গিয়ে অভিনন্দন জানালাম বললেন, 'আসুন, সবাই মিলে খোলা মাঠেই বসা যাক।' সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর সারি সারি চার-পাঁচটি বেতের চেয়ার এসে গেল। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা রু আফজা।

সাদা রেশমের শার্ট, সাদা প্যান্ট। সকাল থেকে হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও মুখে চোখে ক্লান্তির চিহ্ন নেই। বললাম—'অজিতবাবু, এখন তো আর আপনি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী নন। রীতিমত সেন্ট্রাল মিনিস্টার। কেমন লাগছে বলুন।'

শ্রীপাঁজার চোখে মুখে একঝলক হাসির ঝিলিক বয়ে গেল। বললেন, 'খুশি মানে ভীষণ খুশি—আপনাদের সকলের মতই। সবচেয়ে ভাল লাগছে কেন জানেন তো—লার্জ স্কেলে কাজ করার সুযোগ পাব। শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়—সারা ভারতের জন্য, সমগ্র ভারতবাসীর জন্য। এটাই আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ।'

নানা দিক থেকে তখন নানা প্রশ্ন আসতে শুরু করেছে। শ্রীপাঁজা একের পর এক উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। একেবারে খোলামেলা পরিবেশে জরুরি প্রেস কনফারেন্স।

অন্যান্য সাংবাদিকরা একে একে বিদায় নিতেই চেপে ধরলাম পরিবর্তন-এর জন্য একান্ত সাক্ষাৎকার দেবার জন্য। এককথায় রাজী শ্রীপাঁজা। বললাম—'সুসংবাদটা পেলেন কখন?'

শ্রীপাঁজা: আমি তো ছিলাম পাঞ্জাবের ভাটিণ্ডায়। সেখানে ইলেকশন অবজার্ভার হিসেবে আমাকে পাঠিয়েছিল সরকার। গত পরশু (২৩ সেপ্টেম্বর) মাঝরাতে হঠাৎ দিল্লি থেকে ফোন পেলাম—এখুনি দিল্লি ফিরে আসুন। প্রধানমন্ত্রী আপনার সঙ্গে

কথা বলতে চান। গতকাল বিকেল তিনটের সময় ফিরেছি। আমি ভেবেছিলাম বোধহয় পাঞ্জাবের ব্যাপারেই কিছু জানতে চান। তখনও কিছুই জানি না। গতকালই রাত্রি ৯-৩৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী আমাকে জানালেন যে আমি মন্ত্রিত্ব পাচ্ছি। কিন্তু কোন দপ্তরে আমাকে কিছুই বলেননি তখনও। এমনকী আজ সকালে শপথ নেবার সময় পর্যন্তও জানতাম না আমি সত্যিই কোন দপ্তরের ভার পাব। শপথ নেবার পরেই জানলাম, আমাকে পরিকল্পনা দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে মিনিস্টার অব স্টেট হিসেবে।

পরিবর্তন: আপনি কি আগে থেকে এরকম কোন খবরই পাননি বা আশা করেননি যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে চলেছেন?

শ্রীপাঁজা: এক্সপেক্টেশন ছিল না বললে ভুল হবে। উড়ো খবরও পেয়েছিলাম। তাছাড়া আপনারা অর্থাৎ সাংবাদিকরা তো মশাই আগে থেকেই হৈ হৈ ফেলে দিয়েছিলেন যে আমি নাকি মন্ত্রী হচ্ছি। কেউ বলেছেন অমুক দপ্তর, কেউ বলেছেন তমুক দপ্তর। মন্ত্রী হবার আগেই তো আপনারা সব দপ্তরের মন্ত্রী করে দিয়েছিলেন।

হেসে বললেন শ্রীপাঁজা। বললাম—এর আগে রাজ্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দক্ষতা দেখিয়েছেন। এখন আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে কীভাবে কাজ শুরু করবেন ভাবছেন?

শ্রীপাঁজা: চ্যালেঞ্জিং তো বটেই। In fact planning means future, আজকের পরিকল্পনার ওপরই আগামী দিনগুলোর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। তাই পরিকল্পনার ব্যাপারটায় আমায় এমনভাবে এগোতে হবে যাতে ভবিষ্যৎটা কোন সময়েই যেন খোঁড়া না হয়ে পড়ে। পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে আমার প্রাথমিক কাজ হবে, যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগে তার অবজেক্টিভগুলোকে খুঁটিয়ে দেখা। কেন এই প্রকল্পটি হাতে নেব—সে সম্বন্ধে যদি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না হই, তাহলে ভাল কাজ করা সম্ভব নয়। আসলে এই চিন্তাভাবনাটা না থাকার জন্যই আমাদের অনেক পরিকল্পনার পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায়নি। আজ সকালেও আমার দপ্তরে কিছুক্ষণের জন্য গিয়েছিলাম। ডিটেলে কথাবার্তা হয়নি। তবে আমি আমার মূল বক্তব্যটা তাঁদের জানিয়ে দিয়েছি। তাঁরা আমার দৃষ্টিভঙ্গি পছন্দ করেছেন। তাছাড়া ৭ম পরিকল্পনার বিষয়ে বিশদ পড়াশোনার দরকার, বিচার বিবেচনার প্রয়োজন। প্রতিটি বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বসতে হবে আলোচনা করার জন্য। তবে এখনই তো সবকিছু বলা সম্ভব নয়। দপ্তরটাকে ভালভাবে চিনে বুঝেশুনে কাজে হাত দেব।

পরিবর্তন: ভারতের শিল্পোন্নয়নে শিল্প পরিকল্পনা নিয়ে অতীতে অনেক তর্কবিতর্ক উঠেছে। আজও মাঝে মাঝে নানা সমালোচনা শোনা যায়। এ বিষয়ে আপনার চিন্তাধারা কী?

শ্রীপাঁজা: ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হলেও শিল্পকে অবহেলা করা হবে, সেটা উচিত নয়। শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা আজ এগিয়ে গেছিও অনেকটা। তবে নতুন কোন পরিকল্পনা হাতে নেবার আগে খতিয়ে দেখা দরকার সে শিল্পের ভায়াবিলিটি কতটা। গুরুত্ব বুঝেই নতুন পরিকল্পনা হাতে নেব। তাছাড়া সেই শিল্পের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকবেন, তাঁদেরও বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন তাঁরা কী করতে চলেছেন। People who are actually implementing the project must know what is coming up in the project.

পরিবর্তন: পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আপনার মত একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ এবং কর্মিতকর্মা লোককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে পেয়ে যথেষ্ট খুশি। তাঁদের সম্বন্ধে কী ভাবছেন

শ্রীপাঁজা: দেখুন, পশ্চিমবঙ্গ আমার ঘর—আমার সারা জীবনের একটা আশ্রয় সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভাবব না, তা হয় না। বরং একটু বেশি করেই ভাবব। চেষ্টা করব, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অবহেলিত জেলায় উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিতে। তবে

মুখের কথায় তো সব হয় না। আমি একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অন্যান্য রাজ্যের প্রতিও আমার সমান দায়িত্ব রয়েছে। টাকাকড়ি কতটা কী পাওয়া যাবে, তার ওপরেও নির্ভর করতে হবে। তবে কথা দিচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য সার্বিক এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা আমার থাকবে

পরিবর্তন : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হিসেবে প্রণব মুখার্জির আমলে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের একটা বড় অভিযোগ ছিল পশ্চিমবঙ্গের জন্য টাকা দিচ্ছে না। কোন কোন মহল থেকে এমন কথাও উঠেছিল—বাঙালি হয়ে বাংলাকে ডোবাচ্ছেন যদি-

শ্রীপাঁজা : দেখুন বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই, ভবিষ্যতেও তা থাকবে না। তবে একটা কথা বলি—আমার হাতে যদি ৫তলা বাড়ি তৈরির টাকা থাকে আর বামফ্রন্ট সরকার দাবি করেন ৭তলা বাড়ির তাহলে আলাদা কথা। আসলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের তিক্ততার মূলে রয়েছে মালঅ্যাডজাস্টমেন্ট। সেটা দুপক্ষেরই দেখা দরকার।

পরিবর্তন : পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রকল্প শুরু হয়ে মাঝপথে থেমে গিয়েছে কোন না কোন কারণে। সেগুলো আবার শুরু করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেবেন ভাবছেন?

শ্রীপাঁজা : শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়—এমন অবস্থা অনেক রাজ্যেই। আমার কর্তব্য সেগুলো সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। সে কর্তব্য আমি পালন করব।

কথা প্রসঙ্গে দিল্লির নিরাপত্তার কথা উঠল, শ্রীপাঁজা সেদিন যখন মাঠে বসে কথা বলছিলেন, তখনও কোন নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন হয়নি তাঁর বাংলোয়। ১৮নং উইণ্ডসর প্লেসের এই বাংলোটি ফিরোজ শাহ রোড এবং অশোক রোডের সংযোগস্থলেই। সামনের দিকে আর একটি বড় রাস্তা জনপথ, পাশাপাশি রায়সীনা রোডও। বললাম—বাড়ি বদল করবেন নাকি? এত খোলামেলা জায়গায় থাকা মানেই তো

মাঝপথেই হেসে উঠলেন অজিত পাঁজা। বললেন—দেখুন, এসব বেশি ভেবে লাভ নেই। তাছাড়া এ অবস্থা চিরকাল থাকবেও না। বাড়িটা আমার খুব ভাল লাগে। তাই বাড়ি বদলাব না। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে নেমে ভয়ে ভয়ে থাকব তা হয় না।

কথা উঠল পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের অবস্থা নিয়েও। শ্রীপাঁজার বক্তব্য, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীকে নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে নিয়োগ করে প্রধানমন্ত্রী একটা সত্যিকারের ভাল কাজ করেছেন। 'Youth, Energy and Strength' এই তিনটেকে যদি সংক্ষিপ্তকরণ করে দেখবেন, অঙ্কের সমাধানের মত একটা দারুণ সূত্র বেরিয়ে আসছে। তা হল 'yes'। প্রিয় তরতাজা যুবক, করিতকর্মা, বুদ্ধিমান। পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের অবস্থার পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে। তবে অন্যান্য কর্মীদেরও আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

শ্রীপাঁজা এতদিন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সচিব ছিলেন। এখন তিনি তা থেকে পদত্যাগ করেছেন। ১৯৭০-৭১ সালে ছিলেন রাজ্যের বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী। ১৯৭২-৭৭ সালে সিদ্ধার্থশংকর রায় সরকারের তিনি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। সেই সঙ্গেই সাময়িকভাবে কাজ চালিয়েছেন বনদপ্তর এবং পূর্তমন্ত্রী হিসেবেও। গত অষ্টম লোকসভা নির্বাচনে উত্তর-পূর্ব কলকাতা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করে আসেন লোকসভায়। সেখান থেকে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে একেবারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

সাক্ষাৎকার সেরে উঠে আসবার সময় আর একবার অভিনন্দন জানালাম। শ্রীপাঁজা হাতে হাত মিলিয়ে বললেন—একটা অনুরোধ করব আপনাকে। আপনি আমার পক্ষে লিখে দেবেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রতি, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব কলকাতার মানুষদের প্রতি আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের সমর্থনের জোরেই আমি আজকে সাফল্য লাভ করলাম। তাঁদের সকলকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে সবার কাছে পৌঁছন তো সম্ভব নয়। সে দায়িত্বটুকু আপনাদের অর্থাৎ সাংবাদিকদেরই দিলাম। □ ২৭.৯.৮৫

গনি ও পাঁজার এই সাফল্যের চাবিকাঠি কী ?

দীর্ঘ ৯ মাস পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পশ্চিমবঙ্গ আবার যথাযথ মর্যাদা পেল। এখন তিন-তিনটি দায়িত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের তিন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আইনমন্ত্রী হিসেবে অশোক সেন রয়েছেন রাজীব সরকারের প্রথম পর্যায় থেকেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে নতুন করে ফিরে এসেছেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থী এ বি এ গনি খান চৌধুরী 'প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন' দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে। সেই সঙ্গে এই প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন কলকাতা উত্তর-পূর্ব কেন্দ্রের অজিত পাঁজাও। তিনি এখন পরিকল্পনা দপ্তরের স্টেট মিনিস্টার।

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অষ্টম লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে সরে যেতে হয় ইন্দিরা সরকারের বিত্তমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি এবং রেলমন্ত্রী শ্রীচৌধুরীকে। রাজীব তখন তাঁদের স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'আমি আপনাদের মন্ত্রিত্বে রাখতে পারছি না।'

প্রণব আর ফিরে আসেননি। কিন্তু গনি খান ফিরে এসেছেন এবং যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গেই। সঙ্গে এসেছেন অজিত পাঁজা।

প্রথম মন্ত্রিসভায় স্থান না পাওয়ার পর শ্রীচৌধুরী সর্বভারতীয় কংগ্রেসের একজন সাধারণ সচিব হিসেবে কাজের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। প্রণব মুখার্জি একটু দেরিতে হলেও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হতে পেরেছিলেন। অজিত পাঁজা বেশ কয়েকটি পার্লামেণ্টারি কনসাল্টেটিভ কমিটির সদস্যপদ ছাড়াও সুযোগ পেয়েছিলেন পাঞ্জাব নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব– নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হিসেবে ভাটিণ্ডায় উপস্থিত থাকা।

অর্থাৎ রাজীব কাউকেই বসিয়ে রাখেননি। সকলকে কাজ দিয়ে বুঝে নিতে চেয়েছিলেন কে কোন পদের জন্য যোগ্যতর।

গনি খান চৌধুরী কংগ্রেসের সাধারণ সচিব হিসেবে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বে ছিলেন। এই দীর্ঘ ৯ মাস তিনি উত্তরপ্রদেশের সর্বত্র পার্টির কাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন। চেষ্টা করেছেন উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসকে মজবুত করে গড়ে তুলতে। অজিত পাঁজাও পাঞ্জাব নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই পার্টির স্বার্থে কাজ চালিয়ে গেছেন নির্ভয়ে।

সে তুলনায় বলা চলে প্রণব মুখার্জি যেকোন কারণেই হোক, নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন রাজীব সরকার গঠনের পর থেকেই। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হবার পরদিন থেকেই কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। প্রণববাবু তা সামলাতে পারেননি। বাধ্য হয়েছেন পদত্যাগ করতে। দেরিতে হলেও সে পদত্যাগপত্র রাজীব গ্রহণ করেছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, যাঁর কার্যক্ষমতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্বন্ধে কংগ্রেসের বহু নেতাই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

একদিকে প্রিয়রঞ্জনের মনোনয়ন, অন্যদিকে গনি খান ও অজিত পাঁজার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বলাভ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে নিশ্চয়ই একটা বড় ধাক্কা। কারণ এখানে আত্মসন্তুষ্টির কোন সুযোগ আর থাকল না। অন্যদিকে কংগ্রেস দলের মধ্যে শক্ত গ্রুপটিই এখন আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল।

তবে সবকিছুর পরেও একটা কথা মানতেই হবে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের বন্ধ দরজা এখন খুলে গেছে। শোনা যাচ্ছে সামনের ডিসেম্বরে আবার মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটবে। গনি খান এবং পাঁজা যদি তাঁদের প্রতি দেয় সম্মান ও কর্তব্যকে সম্মানের চোখেই দেখেন, তাহলে খোলা দরজা আগামী পাঁচ বছরে অন্তত বন্ধ হবে না। ☐

সু. রা.

ফটো : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

জলপাইগুড়ি ছেড়ে 'কালপুরুষ' এখন কলকাতায়

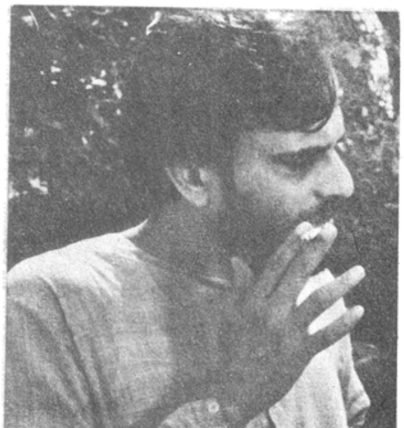


মাধবীলতা ও অর্ককে একটি দৃশ্য বোঝাচ্ছেন চন্দন চন্দ্র

জলপাইগুড়ির সবুজের পর্দা সরিয়ে 'কালপুরুষ' এখন ইট, কাঠ, আবর্জনায় ভরা কলকাতার বস্তিতে, রাস্তায় এবং উত্তর কলকাতার পুরনো এক বিদ্যালয় বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'কালপুরুষ' অবশ্যই কোন একক ব্যক্তিত্ব নয়। অনিমেষ, অর্ক, মাধবীলতা, পরমহংস এমনই অজস্র চরিত্রের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা আজকের সমাজের জীবনের প্রতিভূ।

সমরেশ মজুমদারের 'ট্রিলজি'—উত্তরাধিকার, কালবেলা ও কালপুরুষ। 'কালপুরুষ' নিয়ে ছবি করছেন চন্দন চন্দ্র পেশায় স্কুল শিক্ষক। 'কালপুরুষ'ই চন্দনবাবুর প্রথম কাহিনীচিত্র। তাই প্রশ্ন করলাম, প্রথম ছবি হিসাবে 'কালপুরুষ'কেই বেছে নিলেন কেন? চন্দনবাবু বললেন, 'প্রথমত, আমার মনে হয়েছে সমরেশ মজুমদারের এই গল্পের শুরুতে ৭০ দশকের পর আমাদের সামাজিক অবক্ষয়ের একটা মূল্যায়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই গল্পের একটা পজিটিভ এণ্ডিং বা ইতিবাচক শেষ আছে। গল্পের শুরুতে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া মানুষগুলো আলোর পথে ফিরতে চাইছে। শেষে অর্করা চেষ্টা করছে তাদের আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে। অনিমেষরা তাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে, চিন্তা-ভাবনা দিয়ে যা পারেনি, অর্করা তাদের স্বাভাবিক বোধ উপলব্ধি দিয়ে সেই সামাজিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে, এটাই 'কালপুরুষ' উপন্যাসের বড় কথা। তাই প্রথম ছবি হিসাবে 'কালপুরুষ'কেই বেছে নিলাম।'

চন্দনবাবুর কাছ থেকেই জানলাম, জলপাইগুড়ির পটভূমিতে রঙিন এই ছবির শতকরা ৪০ ভাগ কাজই শেষ হয়ে গেছে। এখন কলকাতায় শুটিং চলছে। কয়েকদিন আগে উত্তর কলকাতার একটি স্কুলে প্রধানা শিক্ষিকার ঘরে ক্যামেরার সামনে দেখা গেল সুমিত্রা মুখার্জিকে। সুমিত্রা এখানে মাধবীলতা। মাধবীলতাকে স্কুলে চাকরি নিতে হয়েছিল। মাধবীলতার সামনে বসা প্রধানা শিক্ষিকার ভূমিকায় রয়েছেন স্মিতা সিংহ। ক্যামেরাম্যান বিবেক ব্যানার্জিকে দেখলাম এই সিকোয়েন্স-এর ক্লোজ, মিড এবং কম্পোজিট শট পরপর নিয়ে চলেছেন। একটু অবসর মিলতেই বিবেকবাবুকে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি যে তিনরকমের শট নিলেন, কই লেন্স বদল করলেন না তো?' মৃদু হেসে বিবেকবাবু বললেন, 'প্রথমত আমি শটটা ওপেন করেছি জুমে। তাই লেন্স আর চেঞ্জ করিনি। আর যদি ব্লক লেন্স ব্যবহার করতাম, তাহলে প্রত্যেকটা শটের জন্য আলাদা আলাদা লেন্স ব্যবহার করতে হত। জুম ব্যবহার করার সুবিধে, এতে ১২ মিলিমিটার থেকে ১২০ মিলিমিটার ফোকাল লেন্সের পরিবর্তন করান যেতে পারে।' কিন্তু ওইদিন শুটিং চলা-কালীন ক্যামেরাম্যান বিবেক ব্যানার্জি পরিচালক চন্দন চন্দ্রকে বলেছিলেন, 'ফিল্মে প্রচণ্ড ইমালশান আসছে।' কিন্তু উপায় নেই বলে পরিচালক শুটিং চালিয়ে গেলেন। পরে বিবেকবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এর ফলে পরবর্তী সময়ে কোন অসুবিধা হবে না তো?' উত্তরে বিবেকবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। কারণ প্রসেসিং-এর পর যদি 'স্ক্যাচ' আসে, তাহলে তো মুশকিল।' সুতরাং, আবার ওইসব দৃশ্যের পুনরায় শুটিং করতে হবে।



অনিমেষ

শেষ ঘণ্টা বাজে। স্কুল ছুটি হয়। স্কুলের দৃশ্যাবলীর শুটিংও শেষ হয়। 'কালপুরুষ' ছবির পরিচালক চন্দনবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'দেখছেন তো কত অসুবিধের মধ্যে কাজ করছি। শুধু একটাই কারণ। এই ছবির বক্তব্য, অনিমেষরা রাজনৈতিক বিপ্লবের' কথা ভেবেছিল, কিন্তু মাধবীলতা অর্কর চেতনায় বিপ্লব এনেছিল। আজ এই চেতনার মধ্যে বিপ্লব আনা প্রয়োজন। তাই পরিপার্শ্বকে নিজে যে চোখে দেখছি, সেই ব্যক্তিগত মূল্যায়নটা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছি। যদি এটা দর্শকরা গ্রহণ করেন, তবে বুঝব আমার পরিশ্রম সার্থক।'

বিবেক আর্ট ফিল্মস প্রযোজিত 'কালপুরুষ' ছবিতে অনিমেষের ভূমিকায় আছেন 'জনঅরণ্য' খ্যাত প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। অর্কর চরিত্রে রূপদান করছেন নবাগত ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া শিল্পী তালিকায় আছেন কমল দেব, সুনীল মুখার্জি,-সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমা মুখার্জি, মুকুন্দ দাস প্রমুখ। □

ফটো : শ্যামল কর্মকার

সঞ্জয় সিংহ

চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির অনুষ্ঠান

মহানায়ক উত্তমকুমারের মৃত্যুর পরই বাংলা চলচ্চিত্রের দুর্দশা বেশি বেড়েছে কিনা সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প বহুদিন ধরেই দুর্বল। অন্যতম কারণ হিসেবে সীমিত প্রদর্শন ক্ষেত্রের কথা বলা হলেও এ ব্যাপারে অভাব রয়ে গেছে আরও অনেক কিছুর। প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতাদের এবং সরকারের করণীয় কিছু যেমন আছে, তেমনই দায়িত্ব আছে হলমালিক ও দর্শকদেরও। তাই প্রয়োজন নানান মহলে এ সমস্যা নিয়ে আলোচনার। অন্যান্য আরও কিছু সংস্থার মত বাংলা চলচ্চিত্র প্রসার সমিতিও এগিয়ে এসেছেন জনমানসে সচেতনতা বাড়াতে। চলচ্চিত্র মহলের গুণীজন সংবর্ধনা তাঁরা বেশ কয়েক বছর ধরেই করে আসছেন। গত বছর তাঁরা এই অনুষ্ঠান করতে পারেননি। সম্প্রতি বিদ্যামন্দিরে এক অনুষ্ঠানে ১৯৮৩ ও ৮৪ সালে বিভিন্ন বিভাগে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তাঁরা পুরস্কার প্রদান করলেন। স্বাভাবিকভাবেই চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট গীতিকার পরিচালক, অভিনেতারাই ছিলেন অনুষ্ঠানের আকর্ষণ। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে সবাই উপস্থিত না থাকলেও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, অনুপকুমার, তরুণকুমার, অনুপ ঘোষাল, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার দেন অভিনেতা বিকাশ রায়, সাহিত্যিক শক্তিপদ-রাজগুরু, সাংবাদিক মদন প্রামাণিক ও ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। □

পুলকেশ ঘোষ

ভাগলপুরে সারা ভারত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ঃ এক সুমধুর স্মৃতি

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ও বনফুলের স্মৃতি বিজড়িত ভাগলপুরের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। কিন্তু বিহারের এই অঞ্চলটি যে শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতির মিলন তীর্থ এই পরম সত্যটি জানা ছিল না। শুনেছিলাম, বাংলার বাইরে ভাগলপুরে বাংলা নাট্য-সংস্কৃতির প্রসারে বিভিন্ন সংস্থা খুবই আশাব্যঞ্জক কাজ করে চলেছে। এইসব সংস্থার মধ্যে অন্যতম হল অ্যামেচার আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। সংক্ষেপে 'ট্রিপল-এ'। 'ট্রিপল-এ' গত ৬ বছর যাবৎ সারা ভারত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এ বছর সপ্তমবারের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্য এই সংস্থা 'পরিবর্তন'-কে আমন্ত্রণ জানায়। পরিবর্তন-এর প্রতিনিধি হিসাবে 'ট্রিপল-এ'র ডাকে সাড়া দিয়ে ওখানে না গেলে বুঝতেই পারতাম না, বাংলার বাইরে বাংলা নাট্যচর্চায় ভাগলপুরের মানুষ কতখানি আগ্রহী। এ ব্যাপারে তাঁরা অনেকখানি এগিয়েও গেছেন। তিনদিনব্যাপী এই একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার শেষে, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারপতি অধ্যাপক ডঃ কান্তি গুপ্ত বললেন, 'এটাকে নাট্য প্রতিযোগিতা বললে ভুল হবে, নাট্যোৎসব বলা উচিত।' এই প্রতিবেদকেরও মনে হয়েছে, সত্যি এই তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান নাট্যোৎসবই বটে। কারণ, প্রথম দুদিনের অনুষ্ঠান হয়েছে অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে। কিন্তু সন্ধ্যে ৬টা থেকে প্রায় রাত ১২টা অবধি একসঙ্গে চারটি, কোনদিন পাঁচটি নাটকও অভিনীত হয়েছে এবং আমার খুবই অবাক লেগেছে অনামী নাট্যদলগুলির নাট্যার্ঘ সমস্ত দর্শক উৎসাহের সঙ্গে দেখেছেন। স্থানীয় সারদা সঙ্গীত সদনের প্রেক্ষাগৃহ অনুষ্ঠান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকে পরিপূর্ণ থাকত। অথচ, কলকাতার নামী দামী নাট্য দল নিয়ে যেসব বাংলা নাট্যোৎসব আমরা দেখি, সেখানে কিন্তু সুরম্য প্রেক্ষাগৃহ প্রায় দিনের পর দিন ফাঁকা থাকে। ভাগলপুরের এই নাট্যপ্রতিযোগিতায় সব নাটকই কিন্তু উচ্চস্তরের নয়, কিংবা বিষয় বৈচিত্র্যে আঙ্গিকের নতুনত্বে ভাস্বর নয়। তবুও উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সমস্ত নাট্যদলকেই সমান ভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং ভাগলপুরের বাঙালি ও অবাঙালি নাট্যপ্রেমী দর্শকরা যে নাটক বোঝেন, তারও প্রমাণ মিলেছে দর্শকের রায়ে শ্রেষ্ঠ নাটক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে।

অনুষ্ঠান শুরু হয় ১৪ সেপ্টেম্বর। ভাগলপুরের ছোট ছোট মেয়েদের নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করে জামালপুরের 'জাগৃতি'। নাটক 'টাপুর টুপুর'। নাট্যকার মনোজ মিত্র। বহুল-অভিনিত এই নাটকটি সারদা সঙ্গীত সদনের মঞ্চে দেখতে দেখতে মনে হল 'জাগৃতি' এই নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝতে পারেননি। প্রহসনের মধ্য দিয়ে শহুরে কপটতা, খলতা নাট্যকার তুলে ধরতে চেয়েছেন, কিন্তু 'জাগৃতি' অভিনীত 'টাপুর টুপুর'-এ শুধুই অভিনেতা অভিনেত্রীরা নির্ভুলভাবে সংলাপগুলি বলে গেলেন। সবচেয়ে পীড়াদায়ক লেগেছে বিশ্বনাথ বসু ও আশীষ ভট্টাচার্যের কিছু 'ম্যানারিজম'। পরের নাটক কলকাতার



'চোরেদের লজ্জা হল' নাটকের একটি দৃশ্য

যাদবপুরের 'ফ্যান্টম' প্রযোজিত 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মণ্ডলের ঘর গেরস্তি'। ত্রুটিপূর্ণ আঙ্গিক ও একই কথার পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট। অর্থাৎ জোতদারের শোষণ, তারপর লাল আলো জ্বালিয়ে জোতদার নিধন। ৪৫ মিনিটের এই নাটকে বিপ্লব বিষয়টি তত পরিষ্কার নয়। 'ফ্যান্টম'-এর পর ভাগলপুরের 'ইয়ুথ কর্ণার' মঞ্চে নিয়ে এল 'কেয়াকুঞ্জ' নাটকটি। বাইরে তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি। সারদা সঙ্গীত সদনের টিনের চালে সেই বৃষ্টির ফোঁটা শব্দের ঐকতান তুলেছে। কিন্তু তারই মধ্যে অতি মেলোড্রামাটিক এক গল্প নিয়ে 'ইয়ুথ কর্ণার'-এর সত্যপ্রিয় ঘোষ, ময়না বসু এবং শ্যামল দাস ও অন্যান্যরা যে বলিষ্ঠ অভিনয় করলেন, কলকাতায় পেশাদার রঙ্গমঞ্চেও এত ভাল অভিনয় দেখা যায় কিনা সন্দেহ! প্রতিযোগিতা শেষে নিখিল ভারত বাংলা নাট্য বিচারক সমিতির দুই সদস্য ডঃ কান্তি গুপ্ত এবং শঙ্কর ঘোষের বিচারে প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে যখন এই নাটকের প্রধান চরিত্র ষষ্ঠীচরণের ভূমিকায় সত্যপ্রিয় ঘোষের নাম ঘোষিত হল, তখন সারা প্রেক্ষাগৃহ করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল। কারণ এই নির্বাচন যথার্থ। এই দিন সবশেষ নাটক বিহারের সিন্ধ্রির এন এল টি জি-র নিবেদন 'একটি কুরশীর তদন্ত'। মূল রচনা চীনা ভাষায়। গল্পের বিষয়বস্তু চমৎকার।



'একটি কুরশীর তদন্ত'—এন এল টি জি

কিন্তু রাত্রির পরিবেশে গড়ে ওঠা এই নাটকে অপরিকল্পিত আলোর ব্যবহার এবং কখনও গদ্যে কখনও পদ্যে অনূদিত সংলাপ কোন নাট্যঘন মুহূর্ত রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও কার্তিকচন্দ্র মজুমদার, দুলাল রায় এবং রতন ধর গুপ্ত ভাল অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন। তবে নাট্যনির্দেশক তপন ঘোষ জমিদারের ভূমিকায় অতি নাটকীয় অভিনয় করে ফেলেছেন।

দ্বিতীয় দিন পাঁচটি নাটকের মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য নাট্য পরিবেশনা হল ভাগলপুরের শরৎ স্মৃতি সংঘ-এর 'প্রেম নয় তরবারি', কলকাতার থিয়েট্রিকাল পিপলস-এর 'চোরেদের লজ্জা হল' এবং কলকাতার নিউ আলিপুরের নাট্যার্ঘ্য-র 'একটি না নাটক', বাকি দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেন কুলটীর সংগ্রামী নাট্যগোষ্ঠী এবং খড়দহের 'অ্যাজিট প্রপ'। বিশেষ করে 'অ্যাজিট প্রপ' প্রযোজিত 'দ্রোণাচার্য' নাটকটির প্রায় সব অভিনেতাই 'স'-র দোষে দুষ্ট। এই দুটি নাটকের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মধ্যেও নতুন কিছু পেলাম না। ভাগলপুরের শরৎ স্মৃতি সংঘ-র নাটক চন্দন সেন রচিত 'প্রেম নয়, তরবারি'-তে প্রযোজনাগত বহু ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু কল্যাণ ঘোষ ও অনুপম সরকারের দুর্দান্ত অভিনয় এই নাটকের প্রধান সম্পদ। এই দিনের দ্বিতীয় নাটক যা প্রতিযোগিতায় বিচারকের রায়ে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ এবং স্থানীয় দর্শকের বিচারে শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে চিহ্নিত থিয়েট্রিকাল পিপলসের 'চোরেদের লজ্জা হল'। আগাগোড়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আড়ালে কদর্য সমাজের অবক্ষয়ীরূপ নাট্যকার শ্যামলতনু দাশগুপ্ত তুলে ধরেছেন। নির্দেশক ও প্রধান চরিত্রে শ্রীনাথ পাল এবং নায়িকা পুষ্পর ভূমিকায় রত্না সরকারও তাঁদের অভিনয়-প্রতিভায় নাটকের বক্তব্য দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। রত্না সরকার পুষ্প চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেছেন। এদিনের সবশেষ নাটক ছিল কলকাতারই নাট্যার্ঘ্যর 'একটি না-নাটক'। দীপেন্দ্র সেনগুপ্তর রচনা ও নির্দেশনায় সম্পূর্ণ নতুন ভাবনায় 'এক্সপেরিমেন্টাল' নাটক। নাটকের টিমওয়ার্কও ভাল। কিন্তু মূল নাটকটি দর্শকের কাছে গিয়ে পৌঁছয় বড় দেরিতে। তার আগে নাট্যকার অযথা এমন কিছু ভনিতার আশ্রয় নিয়েছেন যা ক্লান্তিকর মনে হয়। কিন্তু দীপেন্দ্র সেনগুপ্তর কৃতিত্ব আজকের নাট্য সমাজের সমস্যার সঙ্গে সামাজিক অ-ব্যবস্থাকে 'ড্রামা উইদিন ড্রামা' ফর্মে উপস্থাপিত করেছেন, যা ভবিষ্যতে দর্শকদের যথেষ্ট ভাববার সুযোগ দেবে।

শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর চারটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। এর মধ্যে কলকাতার উন্মেষ নাট্য সংস্থার 'দাও ফিরে সে অরণ্য' প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা ও শ্রেষ্ঠ নাট্য রচনার পুরস্কার অর্জন করে। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে হাওড়ার রামরাজাতলার একের পল্লীর নাটক 'জীবন প্রশ্ন'। তৃতীয় শ্রেষ্ঠ নাটকের কথা আগেই বলেছি, 'থিয়েট্রিকাল পিপলস-এর 'চোরেদের লজ্জা হল'। যদিও এই তিনটি নাটকের বিষয়বস্তুর দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী 'এবং মানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এক

সংবেদনশীল নাটক উপহার দিয়েছেন একের পল্লী। যার জন্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি নারায়ণ সান্যাল ব্যক্তিগতভাবে ১০০ টাকা এই দলের নাট্যকার ও পরিচালক অসীম ঘোষকে পুরস্কার হিসাবে দেন। অসীমবাবু তাঁর নাটকে হিজড়েদের জীবনকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করেছেন। নাটকের একটি গানের মধ্যে দিয়ে নাটকের বক্তব্য ফুটে ওঠে —'দেহে পঙ্গু মানুষ যারা, তাদের হিজড়ে নামে ডাকে, আর মনে পঙ্গু যারা / তাদের কী নামে ডাকে!' ঘটা করে প্রতিবন্ধী বর্ষ পালিত হয়, কিন্তু নাটকের এক চরিত্র যবন যখন বলে, 'আমাদের হিজড়েদের সমস্যা কে ভাবে!' তখন দর্শকরাও চমকে ওঠেন আব্দুল জব্বার তাঁর 'বাংলার



ভাগলপুর ইউথ কর্ণারের 'কেয়াকুঞ্জ'

চালচিত্র' গ্রন্থে হিজড়েদের জীবন এঁকেছিলেন, অসীমবাবুও এক 'ভিন্ন মাত্রায় সেই মানুষদের কথা তাঁর নাটকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এই নাটকের টিমওয়ার্ক দারুণ। তবে এককভাবে জয়শ্রী মুখার্জি এবং মলয় পাল এককথায় অনন্য। জয়শ্রী প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ও মলয় 'সার্টিফিকেট' পেয়েছেন। বিচারকদের রায়ে অবশ্য অন্যরকম উদ্দেহ নাট্যসংস্থার 'দাও ফিরে সে অরণ্য' শ্রেষ্ঠ। যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে ও ঘৃণ্য রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের মানসিকতায় অতিষ্ঠ মানুষ শান্তির খোঁজে নতুনভাবে বাঁচতে চায়। চায় একটু খাদ্য, সুন্দর বাসস্থান আর গোলাপ ফুলের মত সুন্দর জীবন। এই হল 'দাও ফিরে সে অরণ্য' নাটকের বক্তব্য। পরিচ্ছন্ন পরিবেশনা, কিছু কিছু কম্পোজিশান অসাধারণ। নির্দেশক, নাট্যকার সুনীতি ঘোষের অসাধা. অভিনয়ণ দলগত অভিনয়ও সুন্দর কিন্তু দলের অন্য অভিনেতারা যখন এককভাবে অভিনয় করেছেন, তখন অধিকাংশেরই সংলাপ প্রক্ষেপণ ত্রুটিপূর্ণ। অথচ শ্রেষ্ঠ নাট্য দলের কাছ থেকে সব কিছুই শ্রেষ্ঠ হবে এমনটাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এক্ষেত্রে সব কিছু সমভাবে দর্শকরা পাননি। শেষ দিনে আরও দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়, পানিহাটির অভিযাত্রী মঞ্চস্থ করে 'নিহত শতাব্দী'। এবং উত্তরপাড়ার মঞ্চক 'অভিমন্যুর জবানবন্দি'। 'অ্যাবসার্ড' নাটকের আঙ্গিকে গৌতম রায়ের 'নিহত শতাব্দী' নাটকটি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল নাট্যকার জীবনের সম্বন্ধে যেন অকারণেই একটা নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করেছেন। দর্শকরা শুধুই কি নাটকে জীবনের রূপ - রস - গন্ধহীন ক্লেদাক্ত অধ্যায়কে দেখতে চান? অন্তত এই নাটকটি দেখতে দেখতে মাঝে মাঝেই এই প্রশ্নটি আমার মনে উঁকি দিচ্ছিল। তবে নির্দেশক বিজয় পালের নির্দেশনায় এবং আলো ও শব্দের সুষম পরিকল্পনায় (যথাক্রমে বাবুল বোস ও গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়) শেষ পর্যন্ত নাটকটি দর্শকদের আকৃষ্ট করে রেখেছে।' এই নাটক শব্দ ও আলোক পরিকল্পনার জন্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন করে। কিন্তু এই দিনের অপর একটি নাটক 'মঞ্চক'-এর 'অভিমন্যুর জবানবন্দি' বড্ড একঘেয়ে, যদিও শেষটি বড় চমকপ্রদ। 'মঞ্চক'-এর তরুণ শিল্পীবৃন্দের কাছে অনুরোধ, আপনারা নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবুন এবং অনুশীলনে যত্নবান হন। কারণ নাটকের শেষ দৃশ্য 'মঞ্চক' যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, সাধারণত এধরনের নাটকে এমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কম মেলে। ভবিষ্যতের প্রযোজনায় ভাল নাটক এঁরা দেখাতে পারবেন বলে আশা রাখা যায়।

এই প্রতিযোগিতায় সমাপ্তির দিনে স্থানীয় মাঙ্গলিক সঙ্গীত নৃত্য নিকেতন নাচগান পরিবেশন করেন এবং সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল সকল কুশীলবদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ভাগলপুরের 'ট্রিপল এ'-কে ধন্যবাদ। কারণ তাঁদের আমন্ত্রণেই ভাগলপুরে গিয়েছিলাম এবং বর্তমান বাংলা একাঙ্ক নাট্যধারার একটা অংশ প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হল। যদিও বলা হয়েছে সারা ভারত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা কিন্তু ভারতের অন্যান্য ভাষার নাটক তো পেলাম না। তবুও 'ট্রিপল এ'-র তরুণ সচিব অঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক দল তরুণের ঐকান্তিক প্রয়াসে ভাগলপুরে যে সুস্থ সংস্কৃতি - চর্চা হয়ে চলেছে তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এই নাট্যানুষ্ঠান শেষে মনে হল, ভাগলপুরের মানুষের সঙ্গে ভিন রাজ্যের মানুষের সম্পর্কের এক মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন 'ট্রিপল এ'। □

ভাগলপুর থেকে ফিরে সঞ্জয় সিংহ

ইন্দ্রাণী

ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণীর নামের অন্তে মূর্ধন্য 'ণ'। কিন্তু ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনীর নাট্যরূপে (বীরু মুখোপাধ্যায়) কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে অভিনীত 'ইন্দ্রাণী' নাটকের যে 'Synopsis' এবং চরিত্রলিপি আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে, তাতে ইন্দ্রাণীর অন্তে মলাট ছাড়া সর্বত্র দন্ত্য 'ন'। জানি না এই 'ইন্দ্রাণী' কে। অবশ্য নাটকের ইন্দ্রাণী তার পরিচয় দিয়েছে 'পরগাছা' বলে। 'পরগাছা' ছাড়া আর বলেছে, 'আমি শুধু জানি আমি এ বাড়ির আশ্রিতা'। নাটক খানিকটা এগোবার পর দেখলাম ইন্দ্রাণী ঠিকই বলেছে। পিতৃবন্ধু আদর্শ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ভবেন্দ্র চৌধুরীর পরিবারে সে আশ্রিতাই। তবু তার নামেই নাটকের নাম, তাকে নিয়েই নাটক।

আমি ইন্দ্রাণীর কথা দিয়ে শুরু করলেও নাটক কিন্তু শুরু হয়েছে রেখা আর হিরন্ময়কে দিয়ে, দীঘার সমুদ্র সৈকতে। যেখানে তাপস সেন সাদা কাপড়ে আলো ফেলে দুলিয়ে দুলিয়ে সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়েছেন এবং সুরেশ দত্ত কিছু 'দুষ্প্রাপ্য গাছ' পুঁতেছেন। মঞ্চমায়ার বদলে আলোছায়া। দুই প্রবীণ পেশাদারের কিছু দায়সারা ব্যাপার। অবশ্য ব্যাপারটা 'মানিয়ে গেছে' ঐ দৃশ্যের বোম্বাই-মার্কা নাচ এবং গানের জন্যে। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়নি। রেখা না হয় আউটিং-এ গিয়ে নেচেছে, কিন্তু ওর মা সুষমা (চন্দ্রা দস্তিদার) নিজের বাড়িতে অমন ঘোড়দৌড়ের মত করে চলাফেরা করছিলেন কেন? তিনি 'I.C.S জজের মেয়ে, অত্যাধুনিকা, দাম্ভিকা এবং মেজাজী' বলেই কি? তদুপরি তাঁর কণ্ঠ এই নাটকের ছন্দপতনের পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য ছন্দপতনের কৃতিত্ব সবটুকুই তাঁর নয়, অংশীদার আরো কয়েকজন সহ-অভিনেতা এবং সর্বোপরি পরিচালক স্বয়ং।

এই নাটকের পরিচালক অনুপকুমার। তদুপরি তিনি নাটকের মুখ্য অভিনেতাদের একজন। ওঁর অভিনয়ের কথাই আগে বলি। তিনি 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু·····' গেয়ে মঞ্চে ঢুকলেও তাঁর (সুকুমারের) প্রথম সংলাপ ছিল 'মায়ের নকল সাহেবিয়ানা আর রেখার প্যানপ্যানানি আমার ভাল লাগে না'। যে চরিত্র এভাবে নিজেকে ইনট্রো-ডিউস্ করে তাকে আর যাই হোক ভাঁড় ভাবা যায় না। কিন্তু অনুপ সুকুমার চরিত্রটিকে প্রায় ভাঁড়ে রূপান্তরিত করেছেন। ওঁর অভিনয় এখন একঘেয়ে লাগে, ক্লান্তিকর মনে হয়। সস্তা জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করলে শক্তিমান নটেরও এই হালই হয়।

এবার পরিচালক অনুপের কথা বলি। শিল্পী নির্বাচনটা পরিচালকের সম্মতিতেই হয়ে থাকে। তাহলে বলি, বিবাহযোগ্যা ইন্দ্রাণী চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে এখন অন্তত মানায় না, ভেবে নিতে হয়। কিন্তু ভাবতেও কষ্ট হয়। পরিচালক সাবিত্রীর মত একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর প্রতি এই অবিচারটা কেন করলেন? সেটা অবশ্যই অভিনেত্রীর সম্মতিতে। তাই এক্ষেত্রে অভিনেত্রীও সমভাবে দায়ী।

পরিচালকের কিছু 'মুন্সিয়ানার' উল্লেখ করছি।

এক : গোপেনের (রথীন বসু) স্ত্রী সেবা (কল্পনা মুখোপাধ্যায়) যেভাবে তাঁর স্বামীর গলায় গামছা দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে টানাটানি করেছেন, তাতে মনে হয় এটা গামছা টানার রাজ্য রেকর্ড। দুই : ফিল্মি কায়দায় ফ্ল্যাশ-ব্যাক দেখাতে গিয়ে ভবেন্দ্র চৌধুরীকে (হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়) চোখের পলকে যুবক সাজাবার চেষ্টা করে শুধু পরিচালক হাস্যাস্পদ হননি, নাট্য-জগতের একজন প্রবীণের প্রতিও অবিচার করেছেন। তিন : ভবেন্দ্র চৌধুরীর ছবির ওপর আলোর বৃত্ত ফেলে অফ ভয়েসে 'ইন্দ্রাণী ফিরে আয়, ফিরে আয়' বলার বোধহয় একটাই অর্থ হয়— ভবেন্দ্রবাবু বেঁচে নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তিনি বেঁচে রয়েছেন। বলা বাহুল্য এই অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টটাও হারাধনবাবুর ওপর দিয়েই হল! চার : দীপকের (সোমনাথ চৌধুরী) সমস্যা তার দুটি হাত। কোথায় রাখবেন কী করবেন, এই নিয়েই তিনি বিব্রত। যন্ত্রণা বোঝাতে যেভাবে তিনি হাত দুটিকে মাথার পিছনে নিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন তাতে মনে হয়েছে তিনি বুঝি স্পনডি-লাইটিস-এর ব্যায়াম করছেন।

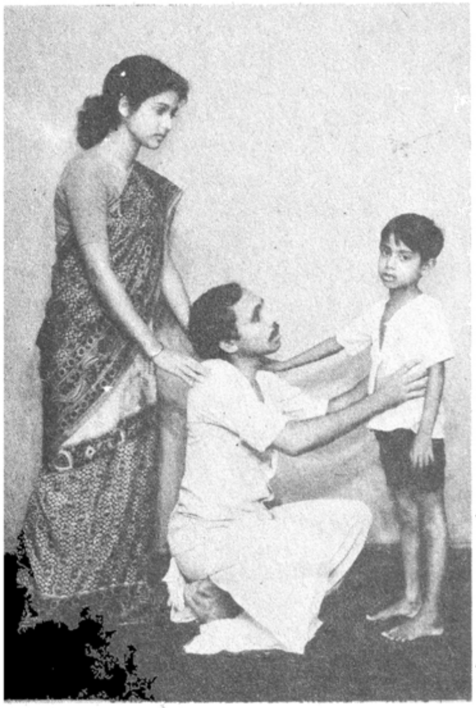
এমন নজির আরো আছে। সেগুলির উল্লেখ করে লেখার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। এই প্রসঙ্গে শুধু বলি, পেশাদার মঞ্চের পরিচালকের কাছে এমনটা আশঙ্কা করা যায় না। পরিচালকের প্রশিক্ষণের ব্যর্থতা, কল্পনাশক্তির দৈন্য, পরিমিত

বোধের অভাব, অবিবেচনাপ্রসূত প্রয়োগের ছাপ এ নাটকের সর্বত্র। এ যেন কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীর আড়াই ঘণ্টার 'গো অ্যাজ য়্যু লাইক'। অথচ অদৃষ্টের কী পরিহাস! পরিচালকের অবিচারের বড় শিকার হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ভবেন্দ্রনাথরূপে বন্ধুকন্যা ইন্দ্রাণীকে যেমন অপত্যস্নেহে লালন করেছিলেন, তেমনি আগাগোড়া নিপুণ অভিনয় করে 'ইন্দ্রাণী' নাটকটিকেও আগলে রেখেছেন। তাঁর পরে উল্লেখ করার মত অভিনয় করেছেন একমাত্র স্মিতা সিংহ। তাছাড়া আর কারো অভিনয় উল্লেখ করার পর্যায়ে আসে না। □

নির্মল বিশ্বাস

'ভুলের মাশুল' নাট্যাভিনয়

গত ৮ সেপ্টেম্বর তিনসুকিয়া দুর্গাবাড়ি রঙ্গমঞ্চে তিনসুকিয়া অনির্বাণ নাট্য সংস্থা প্রযোজিত রাম চক্রবর্তী রচিত সামাজিক নাটক 'ভুলের মাশুল' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনা করেন রাম চক্রবর্তী। দলগত অভিনয়ে নাটকটি দর্শকদের কাছে বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। নাটকের শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে সবার মন জয় করেন মধুমিতা



'ভুলের মাশুল'-এর একটি দৃশ্য। ফটো: সংগৃহীত

ভট্টাচার্য। অভিনয় প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় বাবার ভূমিকায় মনোরঞ্জন শর্মার ও অবিনাশের চরিত্রে বাদল দাসের। এ'দের অভিনয় দর্শক মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। দেবময় মজুমদারের নৃত্য ও মিতালী ব্যানার্জির বিহু নৃত্য দর্শকদের মন ভরিয়ে দেয়।

সঙ্গীত ঃ সমীর চক্রবর্তী ও বেতার মেলোডিয়াস সাউণ্ড। যাঁদের সাহায্যে নাটকটি সুন্দরভাবে মঞ্চস্থ হয়েছিল, তাঁরা হলেন—ডাঃ কীর্তিরঞ্জন দে, ডাঃ সুবিনয় সেন, পিণ্টু সেন, ভবশঙ্কর পোদ্দার, মুকুলিকা দাস, স্বরাজ চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ, সুমনা, সন্ধানী ও যুবপ্রগতি। □

সংবাদদাতা

নিউ থিয়েটার্স-এর অনুষ্ঠান

সুষ্ঠু পরিকল্পনা, যোগ্য পরিচালনা এবং সময়ানুবর্তিতার অভাবে একটি অনুষ্ঠান যে কত ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে পারে, তার এক অনবদ্য ডেমনসট্রেশন দেখলাম গত ২০ সেপ্টেম্বর, অ্যাকাডেমিতে। ঐ সন্ধ্যায় ছিল নিউ থিয়েটার্স গ্রুপের 'অষ্টম প্রবর্তনা উৎসব।'

কথা ছিল—যেহেতু জন্মদিন, তাই প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান শুরু হবে ছটায়। ভাষণ, গান, বাজনা ইত্যাদির পরে সন্ধ্যে সাতটায় আমরা দেখব দলের নতুন নাটক 'ডুব।' কিন্তু পরিবর্তে পর্দা উঠল সাড়ে ছটায়। তাতেও আপত্তি ছিল না, যদি উদ্যোক্তারা পরেও সময়ের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হতেন। শিশুদের মন্ত্রারতি, 'মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান'-এ সদস্যদের গান, সভাপতি আশু সেন, প্রধান অতিথি ডঃ ক্ষুদিরাম দাস এবং অতিথিবৃন্দ ডঃ সরোজমোহন মিত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল চট্টোপাধ্যায়, বিমল বসু, মানবেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও বাবলু দাশগুপ্তকে পুষ্পস্তবক প্রদান, সবকিছুই চলতে থাকে অত্যন্ত ধীর লয়ে।

এরপর সংস্থা সম্পাদক বেণু চট্টোপাধ্যায় এসে স্মারক পত্রিকা থেকে একটি দীর্ঘ ভাষণ পাঠ করলেন। দল সম্পর্কে তিনি বললেন, 'আপাতত দুর্যোগের কাল কেটে গেছে। স্বচ্ছ নির্মেঘ আকাশ আমাদের মাথার উপর।'

'থিয়েটার নিয়ে আলোচনা' করতে এসে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যা বললেন, তা তিনি একটু অন্য ভঙ্গিতে ঐ সন্ধ্যায় প্রকাশিত স্মারক পত্রিকায় 'নাটকের সমস্যা ঃ সামাজিক সমস্যা' শিরোনামে লিখেছেন। ওঁর বক্তব্য—'গণনাট্য সংঘ ও গণনাট্য আন্দোলন আছে বলেই আজও নাট্য আন্দোলন চলছে।' তিনি যান্ত্রিক কৌশল, পেশাদার মঞ্চ এবং অশ্লীল চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধেও বক্তব্য রাখলেন।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস বললেন, 'ভাল নাটক লেখার প্রতিভার অভাব, এছাড়াও নানা অসুবিধে রয়েছে।'

আশু সেন সম্ভবত যথেষ্ট প্রস্তুত না থাকার ফলে কোন কথাই গুছিয়ে পেশ করতে পারেননি। তিনিও গণনাট্য সংঘের কথাই বেশি বলেছেন। মজার ব্যাপার হল, সেদিন মঞ্চে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই কোন না কোনভাবে গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত।

ক্লান্তিকর ভাষণের মধ্যেই শুরু হল সম্মিলিত চিৎকার, বাদানুবাদ, নাটক শুরু [illegible]ার আবেদন। তাতে বক্তৃতা বন্ধ হল। শুরু হল গান। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নরেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ দর্শক বা শ্রোতাদের বিরক্তির পারদ অনেকটাই নামিয়ে দিল। মোট পাঁচটি গানেই তিনি সার্থক।

সবশেষে শুরু হল সেই বহু প্রতীক্ষিত নাটক 'ডুব'। এখানেও আর এক ডেমনসট্রেশন! এই নাটকটি আমাদের বলে দিল, দর্শক দিনদিন গ্রুপ থিয়েটারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছেন কেন। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, এ'রাই একদিন আমাদের 'গাব্বু খেলা' দেখিয়েছিলেন। 'ডুব'-এর নাট্যকার ও নির্দেশক উৎপল চক্রবর্তী বিষয়বস্তু হিসেবে যা বেছেছেন, অর্থাৎ শোষণমুক্তির সংগ্রাম, তা নিয়ে এতাবৎ বহু নাটক লেখা হয়েছে, আজও হচ্ছে। তিনি বলবেন, এ তো সাধারণ মানুষের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। মানছি। কিন্তু তাঁর কলম এবং উপস্থাপনার কাছে আমরা কিছুটা নতুনত্ব নিশ্চয়ই আশা করতে পারি। তিনি নতুন দিকে বাঁক নিতে গিয়ে নাটককে অকারণে জটিল করেছেন। প্রথম অংশটি তো যুক্তিহীনভাবে দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর। নাটকে যেসব চরিত্র এসেছে অর্থাৎ ব্যবসায়ী, শ্রমিক নেতা, মস্তান, পুলিশ—এদের আমরা একই ছকে বাংলা নাটকের মঞ্চে দেখেছি বার বার। উৎপলবাবু এদের দেখিয়েছেন দুজন পোড়খাওয়া মানুষ, দুই মাতাল নদে ও ভগুর কল্পনার মাধ্যমে (এই দুটি চরিত্রে পিনাকী গুহ এবং বেণু চট্টোপাধ্যায়ের টানটান অভিনয়ের আকর্ষণেই শুধু নাটকটি বসে দেখা যায়)। এই সবকিছুকেই আমরা দেখছি এক মাদারি খেলোয়াড় (উৎপল চক্রবর্তী)-এর 'খেল' হিসেবে। প্রথম দৃশ্যে এই 'ওস্তাদ' মঞ্চে আসেন। দৃশ্যটিতে 'রুদ্রাক্ষ' প্রযোজিত 'জীবন চরিত'-এর আলতো ছোঁয়া থাকলেও নাট্যকার-নির্দেশক যেভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে বিভিন্ন পশুরূপে ভেবেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। নাটকের শেষ দৃশ্যেও (যেখানে নদে ও ভগু মাতলামি কাটিয়ে সমাজ-সচেতন হয়ে উঠছে) 'সায়ক'-এর 'দুই হুজুরের গপ্পো'-র একটি কম্পোজিশনের কথা মনে পড়ে যায়। অনেকদিন পরে দেখলাম চিত্ত সরকার আলোর কাজে বেশ মন দিয়েছেন। পিনাকী গুহর মঞ্চস্থাপত্যও শিল্পসম্মত। □

কমলকুমার ঘোষ

তরুণ ভট্টাচার্য এল পি ডিস্কে

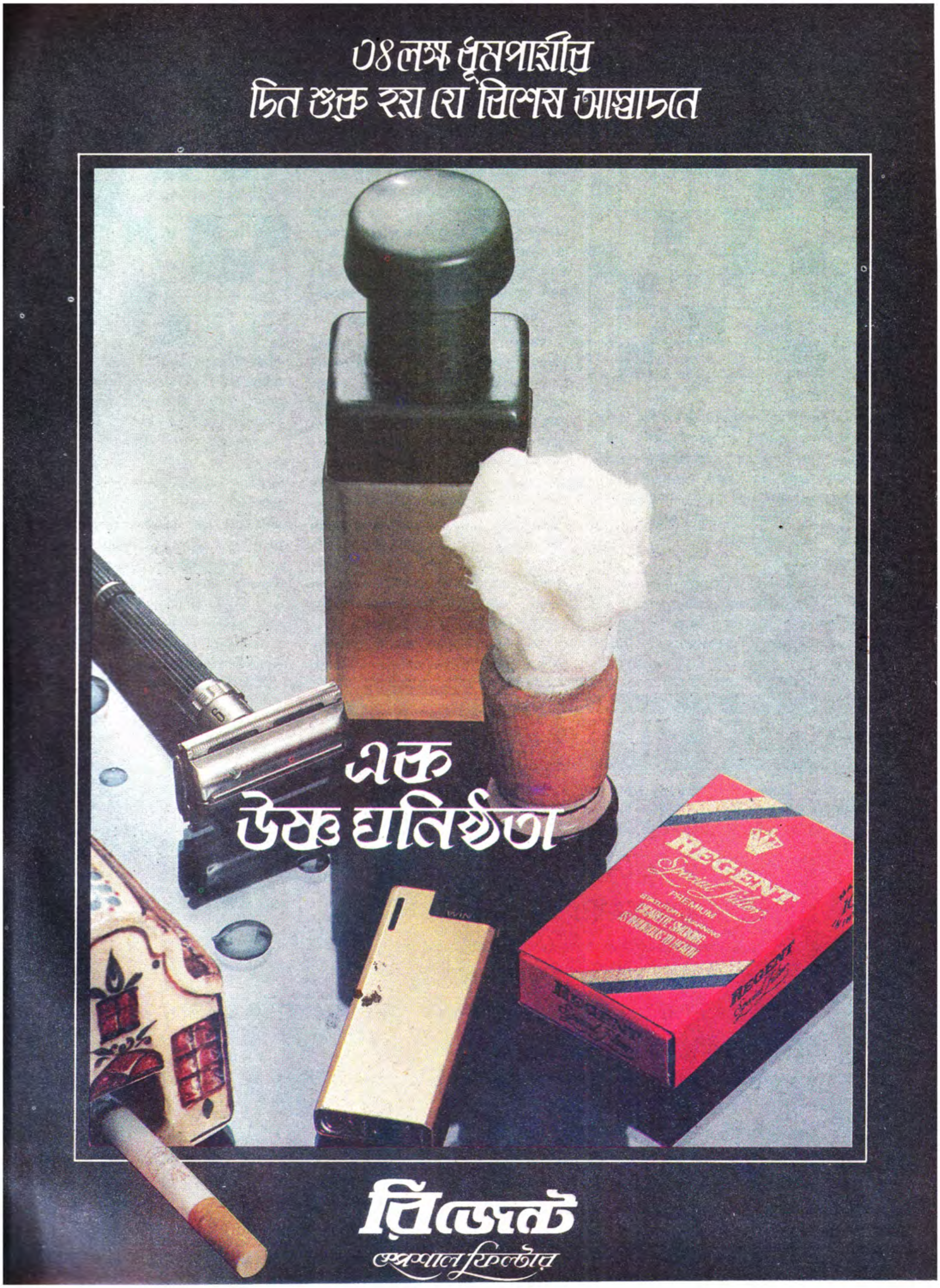
গত পাঁচ বছরের মধ্যে সন্তুর যন্ত্রের যন্ত্রীদের মধ্যে তরুণ ভট্টাচার্য একটি সুপরিচিত নাম। কারণ সন্তুরেই এমন কয়েকটি অলঙ্করণ এ'র বাজনায় শোনা যায় যার মধ্যে উপস্থাপনার অভিনবত্ব আছে। যেমন একশোটি তার এবং স্ট্রাইকারের যুগল সম্পর্কের মধ্যে মীড়ের পরিসর নেই, কিন্তু তার অনুরণনের নৈপুণ্যই তরুণের বাজনায় এমন এক মাধুর্যের সৃষ্টি করে, যার মধ্যে তাঁর নবীন কল্পনা-প্রবণ মনটির প্রতিফলন অনুভব করা যায়। এছাড়া স্বর-নিয়ন্ত্রণে স্বরের প্রাঞ্জল রূপটি প্রতিষ্ঠিত করার নৈপুণ্য তো আছেই। সবার ওপর আছে গুরু রবিশঙ্করের কাছে পাওয়া রাগবিশ্লেষণের মননশীলতা।

প্রথম রাগ 'কিরবানী'। ছোট্ট আলাপেই তিনি রাগের বক্তব্য মর্ম-ছোঁয়া করে তুলেছেন। বিলম্বিত ও দ্রুত গতে বিস্তার যেমন চিন্তাশীল তেমনই বিচিত্র তানকারীতে।

পরের রাগ গুর্জরী তোড়ি। এই রাগের বিষন্ন গাম্ভীর্য তাঁর তীব্র মধ্যম ও কোমল গান্ধারের শ্রুতিতে শুধু মূর্তই হয়ে ওঠেনি—তোড়ির সঙ্গে গুর্জরী তোড়ির পার্থক্য শিল্পী সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন মধ্য ও তারসপ্তকের বিহারে। বৈচিত্র্য এনেছেন কাহারবা ছন্দের ধুনে।

এই ডিস্কের আর এক আকর্ষণ সবীর খানের তবলা। ত্রিতাল, একতাল ও কাহারবার দৃপ্ত ঠেকার সঙ্গে লগ্গি ও কানীর কাজে সবীর একটি মাত্রা যোগ করেছেন। □

সন্ধ্যা সেন


৩৪ লক্ষ ধূমপায়ীর
দিন শুরু হয় যে বিশেষ আস্বাদনে
এক
উষ্ণ ঘনিষ্ঠতা
REGENT
Special Filter
PREMIUM
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING
IS INJURIOUS TO HEALTH
রিজেন্ট
স্পেশাল ফিল্টার

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল-১৭০

১	২		৩		■	৪	৫
৬		■		■	৭		
■		■	৮	৯			■
১০		১১	■		■	১২	
	■		■	১৩	১৪		■
■	১৫		১৬			■	১৭
১৮		■		■	১৯		
	■	২০				■	

সূত্র : পাশাপাশি

১। যে বোহিসেবী খরচ করে ৪। নেশার পানীয় ৬। অল্প পরিমাণ বা ছন্দ পরিমাপের একক ৭। মারধোর করা ৮। হাঁটু গেড়ে বসা ১০। ঠাণ্ডা নয় আদৌ ১২। কপট ১৩। ইন্দ্র ১৫। সমুদ্রের মত হৃদয় যার ১৮। '—' থেকে চাল হয় ১৯। দুপাশে গাছের সারি আছে এমন পথ ২০। যাতে সারবস্তু আছে তাই।

সূত্র : ওপর-নিচ

১। অন্ধকার রাত ২। চরণে চরণে মিলযুক্ত ছন্দ ৩। ভাত ভোজনের উপকরণ-তরকারি ৪। মহাপ্রাণ ব্যক্তি ৫। 'মূল্য' আছে ৭। রাজাধিকারস্থ জনগণ ৯। তরোয়াল ১০। ফুলের 'বাস' ১১। তালুক বা বাড়ির অংশ ১৪। দুধেল বীজ ১৫। দিবস ১৬। প্রথা বা নিয়ম ১৭। মাথার ওপর থেকে আচ্ছাদন সরালেই দেখতে পাবেন ১৮। 'ঋণ' নিন।

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ২৭ নভেম্বর '৮৫ সংখ্যায়। সমাধানটি পরিবর্তন দপ্তরে অবশ্যই ১৩ নভেম্বর '৮৫-র মধ্যে পৌছতে হবে।

সমাধানের সঙ্গে পরিবর্তন-এ প্রকাশিত ছকটি (জেরক্স কপি নয়) অবশ্যই পাঠাতে হবে। বিভিন্ন সংখ্যার শব্দশৃঙ্খল একই খামে পাঠাবেন না। খামের ওপর শব্দশৃঙ্খলের নম্বরটি অবশ্যই উল্লেখ করবেন। একটি খামে একজনই শব্দশৃঙ্খল পাঠাতে পারবেন।

শব্দশৃঙ্খল—১৬৬ (সমাধান)

ক	পি	ল	দে	ব	■	আ	দা
নী	লা	স্ব	রী	■	তা	জা	■
নি	■	মা	■	কা	লা	হা	রি
কা	ন	ন	বা	লা	■	র	■
■	থি	■	র	■	খ	■	অ
চ	■	■	কো	ম	র	ব	ন্ধ
ম	শ	ম	শ	■	শা	রি	কা
ক	ব	ল	■	গা	ন	■	র

শব্দশৃঙ্খল—১৬৬-এর সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য সার্টিফিকেট পাবেন : ১। অভিজিৎ সরকার (আনন্দবাগান, পশ্চিমদিনাজপুর) ২। জয়ন্তী নাগ ঘোষ (কাছারি রোড, দার্জিলিং) ৩। স্বপ্না মণ্ডল (মনসকামনা রোড, মালদহ) ৪। মহঃ বদরুদোজ্জা (পাটকেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ) ৫। রমণীমোহন ভট্টাচার্য (কলকাতা-৭৫) ৬। স্বপনকুমার মোদক (হরিপুর, বর্ধমান) ৭। মলয়কান্তি বসাক (মালিপাড়া, বীরভূম) ৮। মণিদীপা বসু (ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ) ৯। তাপসকুমার ব্যানার্জি (দুর্গাপুর-৫) ১০। বীরেন্দ্রকুমার দেবনাথ (কলকাতা-১) ১১। পিনাকী ব্যানার্জি (ডাবুক, বীরভূম) ১২। সোমা ব্যানার্জি (খড়দহ, ২৪ পরগণা) ১৩। অবনীমোহন বাগচী (স্টেশন পল্লী, হুগলি) ১৪। সুজিত চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা-৫) ১৫। দেবব্রত ব্যানার্জি (বেলমুড়ি, হুগলি) ১৬। স্বপনকুমার মজুমদার (ইসলামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর) ১৭। অলোক নাগ (জামশেদপুর-৯) ১৮। সমীরণ দেবনাথ (বাবুপাড়া, মালদা) ১৯। ভাস্কর ঝা (বীরনগর, পশ্চিমদিনাজপুর) ২০। সুরেশ মিস্ত্রী (গোবিন্দকাটী, ২৪ পরগণা) ২১। আলো ঘোষ (কল্যাণপুর, বাঁকুড়া) ২২। কমলকান্তি চক্রবর্তী (বারইগ্রাম, আসাম) ২৩। মিঠু বন্দ্যোপাধ্যায় (শরৎপল্লী, মেদিনীপুর) ২৪। সাধনকুমার রক্ষিত (কৃষ্ণপুর, মুর্শিদাবাদ) ২৫। রাখী দত্ত (শ্রীরামপুর, হুগলি) ২৬। সুধীর কুণ্ডু (হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি) ২৭। অশোককুমার দাস (গঙ্গারামপুর, পশ্চিমদিনাজপুর) ২৮। শ্যামনারায়ণ ইন্দু (কলকাতা-২৬) ২৯। উদয় ভট্টাচার্য (লামডিং, আসাম) ৩০। রেণুকা গোস্বামী (বেলারী, বর্ধমান)।

শব্দশৃঙ্খল—১৬৬-এর লটারির বিচারক ছিলেন অশোককুমার দত্ত (কলকাতা-৭২)।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।



জ্যোতির্ময় ত্বক·· ·এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল — আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা।'

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ— কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ — যা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS RX 84 2116 BG

PARIBARTAN 23/30 October—5 November 1985 Regn. No. 32815/78 Postal Regn. No. WB/CC—380 Rs. 3.00



নতুন

ম্যাগি হট এন্ড সুইট টম্যাটো চিলি সস্

এতে আছে মসলার সুগন্ধ! আর ঝালে স্বাদ!

খাবারকে সবচেয়ে মুখরোচক করার মত উপকরণ এতে আছে।

হুম-ম্-ম ...... ম্যাগি!

টমাটোতে লংকা দেওয়া লোভনীয় বিশ্ব বিখ্যাত স্বাদ, খাবারকে অত্যন্ত মুখরোচক করে!

এই অসাধারণ স্বাদটি কাটলেট, সিঙগাড়া, ফুলুরি, আলুর চীপস্ এমন কি সাদা দোসাতেও মেশাতে পারেন। ম্যাগি হট এন্ড সুইট টমাটো চিলি সস্ দিয়ে খাবারের নতুন স্বাদ আবার আপনি খুঁজে পাবেন!

আর সঙ্গে ম্যাগির টমাটো কেচাপও নেবেন কিন্তু। চমৎকার এই টমাটোর কেচাপটি পরিবারের সকলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠবে।

ম্যাগির হট এন্ড সুইট টমাটো চিলি সস্ এবং ম্যাগির টমাটো কেচাপ........

এই দুটি অর্পূব স্বাদ আপনি বার বার ব্যবহার করতে চাইবেন।

দুটি চমৎকার স্বাদ যা আপনার খাবারকে অত্যন্ত সুস্বাদু করে তুলবে!

ম্যাগি®

সস্



কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবেন, দুটোই খেতে মজা পাবেন!